POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

شَهۡرُ رَمَضَانَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ فِیۡهِ الۡقُرۡاٰنُ
هُدًی لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الۡهُدٰی وَالۡفُرۡقَانِ ۚ
فَمَنۡ شَهِدَ مِنۡكُمُ الشَّهۡرَ فَلۡیَصُمۡهُ (بقرہ:186)

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে। (আল বাকারা: ১৮৬)

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 16

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 21 এপ্রিল, 2022 19 রমযান 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রমযানের গুরুত্ব

১৮৯৮) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন:যখন রমযান মাস আসে, তখন জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

১৮৯৯) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যখন রমযান মাস আসে, তখন উর্ধ্বলোকের দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দরজা রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করা হয়।

১৯০১) হযরত আবু হুরাইয়াহ (রা.) -র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: যে কেউ লায়লাতুল কদরে ঈমান রেখে পুণ্যের উদ্দেশ্যে ইবাদতের জন্য দাঁড়ায়, তার পূর্ববর্তী ও পশ্চাতবর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর যে কেউ ঈমানের সঙ্গে পুণ্যের উদ্দেশ্যে রমযানের রোযা রাখবে, তার অগ্রবর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

(সহী বুখারী, ৩য়, কিতাবুস সাউম)

খোদা তা'লা তো সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন ভীষণ জ্বরের রোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দান করতে পারেন। মানুষ যখন সততা ও নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহ তা'লার সমীপে নিবেদন করে যে, 'আমাকে তুমি এই মাসটিতে বঞ্চিত রেখো না, তখন খোদা তা'লা তাকে বঞ্চিত রাখেন না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

সামর্থানুযায়ী খোদা তা'লা দ্বারা বিধিবদ্ধ ইবাদত সম্পাদন করা মানুষের কর্তব্য হওয়া উচিত। রোযা সম্পর্কে খোদা তা'লা বলেন- وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَیۡرٌ لَّكُمۡ অর্থাৎ যদি তোমরা রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে।

একবার আমার মনে এই ভাবনার উদয় হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে? আমি জানতে পারলাম যে, তৌফিক লাভের উদ্দেশ্যে। যাতে এর দ্বারা রোযার তৌফিক লাভ হয়। খোদা তা'লাই তৌফিক দেন আর প্রতিটি বস্তু খোদার নিকটই প্রার্থনা করা উচিত। খোদা তা'লা তো সর্বশক্তিমান। তিনি চাইলে একজন ভীষণ জ্বরের রোগীকেও রোযা রাখার শক্তি দান করতে পারেন। অতএব, ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হল সেই শক্তি অর্জিত হওয়া আর তা হয় খোদা তা'লার কৃপা দ্বারা। অতএব, এই দোয়া কর যে, হে আল্লাহ্! এটি তোমার কল্যাণমণ্ডিত মাস, আমি এর থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি, জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কি না।কিম্বা এই পরিত্যক্ত রোযাগুলি রাখতে পারব কি না। আর আমার বিশ্বাস, তাঁর কাছে সামর্থ্য যাচনা করলে এমন অন্তরকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন। খোদা তা'লা চাইলে অন্যান্য জাতির ন্যায় এই উম্মতেও কোনও বন্ধন রাখতেন না, কিন্তু তিনি এই বন্ধন রেখেছেন আমাদের মঙ্গলার্থে। আমার মতে আসল বিষয় হল, মানুষ যখন সততা ও নিষ্ঠাসহকারে আল্লাহ তা'লার সমীপে নিবেদন করে যে, 'আমাকে তুমি এই মাসটিতে বঞ্চিত রেখো না, তখন খোদা তা'লা তাকে বঞ্চিত রাখেন না। এমতাবস্থায় মানুষ যদি রমযান মাসে অসুস্থ হয়, তবে সেই অসুস্থতা তার জন্য রহমত হয়ে থাকে। কেননা প্রত্যেক কর্মের প্রতিফল নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। মোমেনের উচিত নিজ সত্তার মাধ্যমে নিজেকে খোদা তা'লার পথে বিলীন বলে প্রমাণ করা। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে, কিন্তু তার অন্তরে এই সংকল্প ছিল ও ব্যকুলতা ছিল যে, আমি যদি সুস্থ হতাম আর রোযা রাখতাম! আর তার অন্তর এর জন্য আকুল হয়ে থাকে। তবে ফিরিশতার তার জন্য রোযা রাখবে। তবে শর্ত হল সে যেন বাহানা সন্ধানী না হয়। আল্লাহ্ তা'লা এমন ব্যক্তিকে কখনই প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রাখবেন না।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৬)

জনৈক সুফির মতে, আত্মশুদ্ধির মূল বিষয় হল মিতভাষিতা, স্বল্পাহার এবং স্বল্প নিদ্রা। আর রমযান আত্মশুদ্ধির নির্যাসের সমাহার।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

রোযার একটি অনেক বড় উপযোগিতা হল এর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পুণ্যকর্মের জন্য পরিশ্রম সহন করার অভ্যাস গড়ে ওঠে। মানুষ অনেক প্রকারের কাজ করে, কঠোর পরিশ্রমও করে আবার ভবঘুরে হয়েও ঘুরে বেড়ায় আর আড্ডা দেয়। মানুষের শরীর কিম্বা মস্তিষ্ক কোনওটাই পূর্ণ বিশ্রামে থাকে না, কোনও না কোনও কাজে অবশ্যই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু কিছু বৃথা কাজ রয়েছে, কিছু রয়েছে ক্ষতিকর কাজ আর কিছু কাজ কল্যাণকর আর কিছু কাজ রয়েছে অতি উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু রমযান মানুষকে এমন একটি কাজে অভ্যস্ত করে তোলে যার পরিণামে তার মধ্যে পুণ্য কর্মে পরিশ্রম করার অভ্যাস তৈরী হয়। মানুষের জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের বিষয় কোনগুলি? আহার, নিদ্রা ও সহবাস-এগুলিই তো। কোনও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নমুনা হল পারস্পরিক মেলবন্ধন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গো মেলামেশা, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গো সম্পর্ক রাখাও এর অন্তর্গত। কিন্তু এই সম্পর্কের মধ্যে সব থেকে নৈকট্যের সম্পর্ক হল দাম্পত্য সম্পর্ক। অতএব, আহার, নিদ্রা এবং সহবাস- এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যেই মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিহিত। জনৈক সুফির মতে, আত্মশুদ্ধির মূল বিষয় হল মিতভাষিতা, স্বল্পাহার এবং স্বল্প নিদ্রা। আর রমযান আত্মশুদ্ধির নির্যাসের সমাহার। স্বল্পনিদ্রা এমনিতেই এর মধ্যে এসে যায় কেননা রাত্রিতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে হয়, আর স্বাভাবিকভাবেই রমযানে মানুষ স্বল্পাহারও করে কেননা সারা দিন অনাহারে থাকতে হয়। অনুরূপভাবে সহবাসের অভাবও স্পষ্ট। এছাড়া কম কথা বলাও রমযানের মধ্যে পড়ে। এই কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা.) একবার বলেছিলেন, কেবল খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে রাখার নামই রোযা নয়, বরং রোযা হল বৃথা কথাবার্তাও বন্ধ রাখা। অতএব, রোযাদারের জন্য অশ্লীল কথাবার্তা, ঝগড়া বিবাদ ও বৃথা কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা জরুরী। অনুরূপভাবে কম কথা বলাও রমযানের মধ্যে এসে গেছে। অর্থাৎ স্বল্পাহার, স্বল্পভাষিতা, স্বল্পনিদ্রা এবং সহবাস কম করা- এই চারটি বিষয় রমযানের অন্তর্ভুক্ত। এই চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মানব জীবনের সঙ্গো এগুলির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অতএব, একজন রোযাদার যখন এই চারটি সুখ-স্বাচ্ছন্দের উপকরণ হ্রাস করে, তখন তার মধ্যে কষ্ট সহন করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়। আর সে জীবনের প্রতিটি যুগে বীরত্বের সঙ্গো বিপদের মোকাবেলা করে এবং সফলতা লাভ করে।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬)

জুমআর খুতবা, ১৮ মার্চ, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: এক আরব ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে হানাফী ফিকাহ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে নিজের সম্পর্কে লিখেছেন- 'আমি হানাফি ফিকাহকে বেশি গুরুত্ব দিই না। কেননা আমিও অনুমান ভিত্তিক ধর্মবিশ্বাসের বিরোধী।' অতঃপর তিনি জানতে চান যে, আমি কি জাহিরিয়া ফিকাহ অনুসরণ করতে পারি? কেননা জাহিরিয়া ফিকাহ কুরআন ও হাদীসের বাহ্যিক রূপের উপর আমল করার বিষয়ে অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। হুযুর আনোয়ার (আই.) ২১ ডিসেম্বর ২০২০ এর সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন-

আপনি নিজের পত্রে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেছেন, সেখানে তিনি তৎকালীন যুগের দুটি পক্ষের কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে সংযোজন ও বিয়োজন সংক্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করেছেন এবং কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা বর্ণনা করে জামাতকে নসীহত করেছেন যে, কোনও হাদীস যত তুচ্ছ মর্যাদার হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন করীম এবং সুন্নতের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত না বাধে, সেটিকে মানুষের ফিকাহ্‌র উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর ফিকাহ্‌র ভিত্তি হওয়া উচিত কুরআন করীম, রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নত এবং হাদীস,কিন্তু কোনও বিষয়ের সমাধান যদি এই তিনটির মধ্যে পাওয়া না যায়। তবে হানাফি ফিকা অনুযায়ী আমল করে নেওয়া উচিত। কালের পরিবর্তনের কারণে হানাফি ফিকাহতেও যদি কোনও সঠিক দিক-নির্দেশনা না পাওয়া যায়, তবে এক্ষেত্রে আহমদী উলেমারা বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করুক। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, 'আমাদের জামাতের উচিত হবে যে, যদি কোনও হাদীস কুরআন করীম ও সুন্নতের পরিপন্থী না হয়, তবে তা যতই তুচ্ছ হোক তার উপর আমল করা উচিত এবং মানুষের তৈরী ফিকাহর উপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

আর যদি হাদীসে সে বিষয়টির সমাধান না পাওয়া যায় আর সুন্নতেও পাওয়া না যায় আর কুরআন করীমেও না পাওয়া যায়, তবে এমন পরিস্থিতিতে হানাফি ফিকাহর উপর আমল করুন। কেননা এই ফির্কার সংখ্যাধিক্য খোদার অভিপ্রায়ের মোহর লাগায়। আর যদি কিছু পরিবর্তনের কারণে ফিকাহ হানাফি কোন সঠিক ফতোয়া দিতে সক্ষম না হয়, তবে সেক্ষেত্রে এই জামাতের উলেমারা নিজেদের খোদা প্রদত্ত বিচার শক্তিকে কাজ লাগাক। কিন্তু সাবধান! মৌলবী আব্দুল্লাহ্ চাকড়ালবীর ন্যায় অকারণে হাদীসকে অস্বীকার করে বসবেন না, তবে যেখানে কুরআন ও সুন্নাতের সঙ্গে কোনও হাদীসের সংঘাত বাধতে দেখা দেয়, সেই হাদীসটি পরিহার করুন। "

(রিভিউ মুবাহাসা বাটালবী ও চাকডালবী, রুহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২১২)

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাত আহমদীয়া হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর উপদেশ সম্পূর্ণভাবে মেনে চলে আর যখনই কোনও বিষয় নিয়ে বিচার করার প্রয়োজন হয়,তখন জামাতের উলেমারা খিলাফতে আহমদীয়ার ছত্রছায়ায় বিষয়টি নিয়ে বিচার বিবেচনা করে।

কোনও আহমদী দ্বারা অনুমানকে অপছন্দ করা এবং এর ভিত্তিতে ফিকাহ হানাফিকে খারাপ মনে করা সঙ্গত নয়। বিদ্বান ও বিচারকারীদের দ্বারা বৈধ সীমার মধ্যে থেকে কুরআন ও সুন্নত ও হাদীস থেকে কোনও বিষয় প্রমাণ করে অনুমান করার পদ্ধতি অবলম্বন করা নিষিদ্ধ নয়। কেননা কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.)-এর উক্তিতে অনুমানের পক্ষে একাধিক যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে। এছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের যুগে অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাজ করেছেন এবং নিত্যনতুন সমস্যাবলীকে আঁ হযরত (সা.)-এর যুগের কোনও একটি ঘটনার ভিত্তিতে অনুমান করে সমাধান বের করেছেন।

অনুরূপভাবে অনুমান সম্পর্কে যারা হযরত ইমাম আবু হানিফাকে যারা কটাক্ষ করেছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এটিকে অপছন্দ করেছেন। একবার মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব এই ধরণের ভুল করলে তিনি তাকে সম্বোধন করে হযরত ইমাম আবু হানিফার মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন: হে হযরত মৌলবী সাহেব! আপনি অসন্তুষ্ট হবে না। ইমাম বুযুর্গ আবু হানিফা সম্পর্কে যদি আপনাদের সামান্যতম সুধারণা থাকত, তবে তাঁর সম্পর্কে এমন লঘু শব্দ ব্যবহার করতেন না। আপনি ইমাম সাহেবের মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত নন।তিনি এক মহা সমুদ্র ছিলেন। অন্যরা সকলে তাঁর শাখা মাত্র। তাঁকে নিজস্ব মতামত পোষণকারী নামে কটাক্ষ করা ঘোর বেইমানী। ইমাম বুজুর্গ হযরত আবু হানিফা পরম জ্ঞানী হওয়ার পাশপাশি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নতকে কুরআনের বিষয় থেকে পৃথক করার কাজে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। খোদা তা'লা হযরত মুজাদ্দি আলফি সানির উপর রহম করুন। তিনি মকতুবের ৩০৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন- আগমণকারী মসীহর সঙ্গে কুরআন করীমের মাসায়েল পৃথক করার ক্ষেত্রে মহা ইমাম সাহেবের সঙ্গে এক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। "

(আল হক মুবাহাসা লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১০১)

ফিকাহ জাহিরিয়া সম্পর্কে বলতে হয় যে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কুরআন করীম এবং নবী করীম (সা.)-এর হাদীসে বর্ণিত অনেক নির্দেশাবলী এমন রয়েছে, সেগুলিকে যদি তাদের বাহ্যিক শব্দাবলীকে গ্রহণ করা হয়, তবে সেই সব নির্দেশের প্রজ্ঞা ও মর্মস্থল পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য, সেই পন্থাটি অবলম্বন করা যা আঁ হুযুর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী তাঁর একনিষ্ঠ দাস এবং এ যুগের ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা লাভ করে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর যার উল্লেখ উপরে করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক আল আজহার ইউনিভার্সিটির এক মহিলা কর্মকর্তার ফতোয়া 'কুরআন করীমে এমন কোনও আয়াত নেই যা মুসলমান মেয়েকে অ-মুসলিমকে বিয়ে করতে বাধা দেয়'-এর বিষয়ে দিক-নির্দেশনা চাইলে হুযুর আনোয়ার (আই.) ২১ শে ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের চিঠিতে লেখেন-

কুরআন করীম ছাড়াও ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি হল ইসলামের প্রবর্তক হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সুন্নত এবং কুরআন ও সুন্নতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদীস। তাই আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে যেখানে কুরআন করীমে বর্ণিত বিধিনিষেধ পালন করার আদেশ দিচ্ছেন, সেখানেও এও বলেছেন-

قُلۡ اِنۡ کُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰہَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ یُحۡبِبۡکُمُ اللّٰہُ وَیَغۡفِرۡ لَکُمۡ ذُنُوۡبَکُمۡ ؕ وَاللّٰہُ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ○ قُلۡ اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَالرَّسُوۡلَ ۚ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُحِبُّ الۡکٰفِرِیۡنَ ○

অর্থাৎ হে রসুল তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস,তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর; আল্লাহ্ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। বস্তুত: আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

তুমি বল, 'আল্লাহ্ ও এই রসুলের আনুগত্য কর; কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।

(আলে ইমরান: ৩২-৩৩)

অনুরূপভাবে তিনি বলেছে-

:وَمَاۤ اٰتٰکُمُ الرَّسُوۡلُ فَخُذُوۡہُ ٭ وَمَا نَہٰکُمۡ عَنۡہُ فَانۡتَہُوۡا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰہَ ؕ اِنَّ اللّٰہَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ

অর্থ: এবং রসুল তোমাদিগকে যাহা দান করে উহা গ্রহণ কর, এবং যাহা হইতে তোমাদিগকে নিষেধ করে উহা হইতে তোমরা বিরত থাক। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শক্তি প্রদানে অতীব কঠোর।

(আল হাশর:৮)

এই মূল নীতিগুলি জানার পর আমরা যখন মুসলমান মহিলার কোনও অ-মুসলিম পুরুষকে বিয়ের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করি, তখন দেখতে পাই, কুরআন করীমে একজন মুসলমান মহিলাকে প্রত্যেক মুশরেক, কাফের এবং আহলে কিতাব পুরুষকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ২২২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আদেশ করছেন- মুশরিকরা যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান না আনে, তাদের সঙ্গে তোমাদের মেয়েদের বিয়ে দিও না।

সূরা মায়েদার ৬ নং আয়াতে যেখানে মুসলমানদের জন্য আহলে কিতাবের এবং আহলে কিতাবের জন্য মুসলমানদের খাদ্য বৈধ আখ্যায়িত করা হয়েছে, সেখানে মুসলমান পুরুষদেরকে আহলে কিতাব মহিলাদের সঙ্গে নিকাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মুসলমান মহিলাদেরকে আহলে কিতাব পুরুষদের সঙ্গে নিকাহ করার উল্লেখ না করার মাধ্যমে এর থেকে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা মুমতাহিন-এর ১১ নং আয়াতে হিজরত করে আসা মুসলমান মহিলাদেরকে কাফেরদের কাছে ফিরিয়ে না দেওয়া এবং সেই মহিলাদেরকে কাফেরদের জন্য এবং কাফেরদেরকে সেই সব মুসলমান মহিলাদের জন্য বৈধ না হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার মাধ্যমে কাফেরদেরকেও মুসলমান মহিলাদেরকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআন করীমের এই আয়াতগুলি ছাড়াও আঁ হযরত (সা.)এর সুন্নত এবং নির্দেশাবলী থেকে কোথাও প্রমাণ হয় না তিনি তাঁর কোনও নিকটাত্মীয়াকে কোনও অমুসলিমদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন বা কুরআনের এই আদেশাবলী অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুলুল্লাহ্

জুমআর খুতবা

শরিয়তকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা করা উচিত যুগ খলীফা পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকে- এটিও খিলাফতের কল্যাণের মধ্যে একটি।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

"রসুলের প্রতি কি অসাধারণ আনুগত্য! ভীষণ বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে, সাহাবারা যুদ্ধ না করার পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও রসুলুল্লা (সা.) এর নির্দেশ পূর্ণ করার জন্য যাবতীয় বিপদ মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।"

পৃথিবীর উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে দোয়া করার প্রতি আহ্বান। 'বিশেষ করে দোয়া করুন যে জগতবাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে শুরু করে।"

জামেয়া আহমদীয়া কানাডার সাবেক প্রিন্সিপাল ও মুবাল্লিগ ইনচার্য কানাডা- মাননীয় মৌলানা মুবারকক নাজীর সাহেবের পুণ্যময় স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১৮ মার্চ, ২০২২, এর জুমুআর খুতবা (১৮ আমান, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর জীবনচরিতের আলোচনায় যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের বিষয়ে তার ধ্যানধারণা এবং তাদের সাথে তার ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ বিষয়ে ইতিহাসগ্রন্থ তাবারিতে যে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় তা হলো, কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া আসাদ ও গাতফান এবং তার গোত্রের সকল লোক নবুয়্যতের মিথ্যাদাবিদার তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদের হাতে একত্র হয়ে যায়। আসাদ গোত্রের লোকেরা সামীরা নামক স্থানে সমবেত হয়। আদ জাতির এক ব্যক্তির নামে এই জায়গার নাম সামীরা রাখা হয়েছে, যা মক্কা যাওয়ার পথে অবস্থিত। এই অঞ্চলের আশপাশে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় রয়েছে, এই নামকরণের এটিও এটি কারণ। ফাযারা এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা নিজেদের সমর্থকদের সাথে তিবার দক্ষিণে জমায়েত হয়। তায় গোত্রের লোকেরা নিজ অঞ্চলের সীমান্তে সমবেত হয়। সা'লাবা বিন সা'দ, মুররা এবং আবাস গোত্র হতে তাদের সমর্থকরা রাবাযার আবরাক নামক স্থানে সমবেত হয়। রাবাযাও মদিনা থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত মদিনার উপত্যকাগুলোর মাঝে একটি উপত্যকা। আবরাকুয্ যাবাদাহ জায়গাটি বনু যুবইয়ান গোত্রের স্থানগুলোর অন্তর্গত ছিল। বনু কিনানার কিছু লোকও এদের সাথে এসে যুক্ত হয়, কিন্তু সেই এলাকায় তাদের সংকুলান সম্ভব হয় নি, যে কারণে তারা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি দল আবরাকে অবস্থান করে আর অপরটি যুল কাস্সায় চলে যায়। যুল কাস্সাও মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গা। তুলায়হা তাদের সাহায্যকল্পে হিবালকে প্রেরণ করে। হিবাল ছিল তুলায়হার ভ্রাতুষ্পুত্র। যাহোক, এভাবে হিবাল যু ল কাস্সায় অবস্থানকারীদের নেতা হয়ে যায় যেখানে আসাদ, লায়স, বীল ও মুদলেজ গোত্র হতে তাদের সমমনারা উপস্থিত ছিল। অওফ বিন ফুলান বিন সিনান আবরাকে অবস্থিত মুররা গোত্রের নেতা নিযুক্ত হয় আর সা'লাবা ও আবাস গোত্রের নেতা নিযুক্ত হয় হারেস বিন ফুলান, যে ছিল বনু সুবায়ের সদস্য। এসব গোত্র নিজ নিজ প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে যারা মদিনায় একত্র হয়, অর্থাৎ এরা একত্র হয়ে প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রস্তুত করে প্রেরণ করে। তারা এসে মদিনার গণ্যমান্যদের কাছে ওঠে। হযরত আব্বাস (রা.) ছাড়া বাকি সবাই তাদেরকে নিজ বাড়িতে আতিথেয়তা করে এবং তাদেরকে তারা হযরত আবু বকর (রা.) -এর সকাশে এই প্রস্তাবসহ নিয়ে আসেন যে, এরা নামায পড়বে কিন্তু যাকাত দিবে না। আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সত্য ও ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরা যদি এই উট বাঁধার রশিও না দেয় তাহলেও তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ করব।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪-২৫৫) (আসসীরাতুন নবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৩৪) (মুজামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯০ ও ৬৭, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৯) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ২৩৬)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় অবস্থান দেখে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের দলগুলো যখন মদিনা থেকে ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের অবস্থা কীরূপ ছিল তার উল্লেখ করতে গিয়ে এক জীবনীকার লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃঢ় সংকল্প দেখার পর এই প্রতিনিধি দলগুলো মদিনা থেকে ফিরে যায়। কিন্তু যাবার সময় দুটি কথা তাদের মাথায় ছিল। প্রথমত যাকাত না দেয়ার ব্যাপারে কোন আলোচনা সফল হবার নয়। এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা সুস্পষ্ট আর খলীফার নিজ মতামত ও দৃঢ় অবস্থান থেকে পিছু হটার কোন আশা নেই। বিশেষ করে দলিলপ্রমাণ সুস্পষ্ট হওয়ার পর মুসলমানরা যখন তার সাথে সহমত আর তারাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাহায্য ও সমর্থনে বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয়ত তাদের (অলীক) ধারণা অনুসারে মুসলমানদের দুর্বলতা এবং সংখ্যাস্বল্পতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মদিনায় প্রবল আক্রমণ করা উচিত যাতে ক্ষমতার অবসান ঘটে।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার, শখ্সিয়্যত অউর কারনামে, প্রণেতা- ডক্টর আলি মহম্মদ সালাবী, পৃ: ২৭৮)

অর্থাৎ তাদের (অলীক) ধারণা ছিল আমরা যদি এমনটি করি তাহলে এভাবে আমরা (মদিনা) করায়ত্ব করে নিব। যাহোক, এই (প্রতিনিধি দলের) লোকেরা ফেরত গিয়ে নিজ নিজ গোত্রসমূহকে বলে এখন মদিনার লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম, অর্থাৎ তাদেরকে (মদিনা) আক্রমণ করার জন্য উস্কানী দেয়। অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.)ও এ বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না।তিনি সেই প্রতিনিধি দল চলে যাবার পর মদিনার সকল চৌকিতে রীতিমতো প্রহরী মোতায়েন করেন। হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ(রা.)-কে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। এক বর্ণনায় হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) ও হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.)-এর নামও উল্লেখ রয়েছে যে, তাদেরকেও চৌকিতে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়। এছাড়াও হযরত আবু বকর (রা.) সকল মদিনাবাসীকে মসজিদে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন।এরপর তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এ ভূখণ্ডের সবাই কাফির হয়ে গেছে আর তাদের প্রতিনিধিদলতোমাদের সংখ্যাস্ব ল্পতা দেখে গেছে এবং তোমরা জান না তারা দিনে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবে নাকি রাতে। তাদের সবচেয়ে নিটবর্তী দলটি এক বারীদ দূরে অবস্থান করছে, অর্থাৎ বারো মাইল, এক বারিদ সমান বারো মাইল হয়ে থাকে। কিছু লোক চাইত, আমরা তাদের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে তাদের সাথে সমঝোতা করে নিই, কিন্তু আমরা তাদের কথা মানি নি, বরং তাদের প্রস্তাবনা নাকচ করে দিয়েছি। যাহোক, এখন শত্রুর মোকাবিলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ কর। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ধারণা পুরোপরি সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। আর যাকাত প্র দানে অস্বীকারীদের প্রতিনিধিদল মদিনা থেকে ফেরত যাওয়ার পর কেবল তিন রাতই অতিবাহিত হয়েছিল আর (এরপর) রাত নামতেই তারা মদিনার ওপর আক্রমণ করে বসে।

তাদের একটি দলকে তারা যু -হিস্সায় রেখে আসে যেন তারা প্রয়োজনের সময় শক্তি যোগানোর কাজে আসতে পারে। যু -হিস্সা বনু

ফাযারার একটি ঝরনা আর এটি রাবাযা ও নাখলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। যাহোক এই আক্রমণকারীরা রাতের আধারে মদিনার নিরাপত্তা চৌকিগুলোর কাছে পৌঁছে যায় যেখানে আগে থেকেই সৈন্য মোতায়েন করা ছিল, তাদের পেছনে আরো এমন কিছু লোক ছিল যারা উঁচুতে আরোহণ করছিল। নিরাপত্তারক্ষীরা তাদেরকে শত্রুদের হামলা সম্পর্কে সর্তক করে এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে শত্রুর আগ্রাসন সম্পর্কে অবগত করার জন্য দূত প্রেরণ করে। হযরত আবু বকর (রা.) সবাইকে নিজ নিজ জায়গায় দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন, ফলে সকল সেনাদল তেমনই করে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে উপস্থিত মুসলমানেদেরকে নিয়ে উটে আরোহণ করে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, ফলে শত্রুরা পিছু হটে যায়। মুসলমানেরা নিজেদের উটে আরোহণ করে তাদের পিছু ধাওয়া করে যু -হিস্সা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আক্রমণকারীদের সাহায্যকারী দল চামড়ার থলেতেবাতাস ভরে সেগুলোতে রশি দিয়ে বেঁধে মুসলমাদের মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হয়। তারা তাদের পা দিয়ে আঘাত করে এই পানি বহনের থলেগুলোকে উটের সামনে ঝুলিয়ে দেয়। উট যেহেতু ঝুলন্ত দদুল্যমানকোন জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় তাই (চামড়ার) পানির থলেগুলোকে দুলতে দুলতে আসতে দেখেমুসলমানদের উটগুলো এমনভাবে ভয় পেয়ে দৌঁড়াতে থাকে যে, উটের ওপর আরোহিত মুসলমানরা কোনভাবেই (উটগুলোকে) নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি আর এভাবে অবশেষে তারা মদিনায় পেঁ ছৈ যায়। অবশ্য এতে মুসলমানদের কোনো ক্ষতি হয় নি আবার কোনকিছু তাদের হস্তগতও হয় নি।

মুসলমানদের বাহ্যত এই সাময়িক পিছপা হওয়ার ফলে শত্রুরা এই ধারণা করে যে, মুসলমানরা দুর্বল, তাদের মাঝে মোকাবিলা করার কোনো শক্তি নেই। তাদের এই অলীক ধারণার মাঝে তারা যুল কাস্সায় অবস্থানরতসঙ্গীদের এই ঘটনা অবগত করে, তারা এই সংবাদের ভিত্তিতে এই দলের কাছে পেঁ ছৈায়। কিন্তু তারা জানতো না যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিষয়ে ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যা তিনি যেকোন মূল্যে বাস্তবায়ন করে ছাড়বেন। হযরত আবু বকর (রা.) রাতভর নিজের সেনাবাহিনীর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন আর সবাইকে প্রস্তুত করে রাতের শেষভাগে পুরো সৈন্যবাহিনীকে বিন্যস্ত করে পায়ে হেঁটেই যাত্রা করেন।নোমান বিন মুকার্‌রিন (রা.) (সেনাদলের) ডান বাহুতে , আব্দুল্লাহ্ বিন মুকার্‌রিন (রা.) (সেনাদলের) বাম বাহুতে এবং সওয়ায়েদ বিন মুকার্‌রিন (রা.) সেনাদলের পেছনের অংশের দায়িত্বে ছিলেন, তাদের সাথে কতিপয় বাহনে আরোহী সেনাও ছিল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুসলমানরা এবং যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীরা একই মাঠে মুখোমু খি ছিল। মুসলমানদের আগমনের আভাস ও সাড়াশব্দও তারা পায় নি, মুসলমানরা তাদের ওপর তরবারি নিয়ে অতর্কিতে হামলা করে বসে। রাতের শেষ প্রহরে যুদ্ধ হয়।

সূর্যের কিরণ তখনও দিগন্তকে আপন আলোয় আলোকিত করে নি এমন সময় অস্বীকারকারীরা পরাজিত হয়ে পলায়নের পথ বেছে নেয়।

আরো লিখা আছে, মুসলমানরা তাদের সব পশু-পাখি করায়ত্ব করে নেয়। এ ঘটনায় হিবাল মারা যায়। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবণ করতে করতে যুল কাস্সায় গিয়ে উপস্থিত হন। এটি প্রথম বিজয় ছিল যা আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) নোমান বিন মুকার্‌রিনকে কিছু লোকসহ সেখানেই মোতায়েন করেন আর তিনি নিজে মদিনায় ফিরে আসেন। এটি 'তাবারী'র ইতিহাস থেকে নেওয়া।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৫-২৫৬) (আল বাদায়াতু ওয়ান নাহাইয়াতু, ৩য় খণ্ড, ভাগ-৬, পৃ: ৩০৮) (আল মুনজাদ) (মুজামুল বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৯৭)

এই যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের সাথে সাদৃশ্য দিতে গিয়ে একজন লেখক লিখেন, উক্ত ঘটনায় হযরত আবু বকর (রা.) যে ঈমান, বিশ্বাস, সংকল্প ও অবিচলতা এবং সাবধানতাও সতর্কতা প্রদর্শন করেছেন তাতে মুসলমানদের হৃদয়ে মহানবী (সা.) এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধের স্মৃতি জাগ্রত হয়।

আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালের এই প্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের সাথে অনেকাংশেইসাদৃশ্যপূর্ণ। বদরের যুদ্ধে স্বল্পসংখ্যক, অর্থাৎ শুধু ৩১৩ জন মুসলমান ছিল, যার বিপরীতে মক্কার মুশরিকদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক ছিল। উক্ত সময়ে, অর্থাৎ হযরত আবু বকরের সাথে বিরুদ্ধবাদীদের যুদ্ধের যে ঘটনা ঘটেছে তখনও মুসলমানদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। এর বিপরীতে আব্‌স, যুবইয়ান এবং গাতফান গোত্রসমূহ বিশাল জনবল নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করেছিল। বদরের যুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় দান করেন আর এখানেও আবু বকর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা দৃঢ় ঈমানের স্বাক্ষর রেখেছেন আর শত্রুদের ওপর বিজয় লাভ করেছেন। যেভাবে বদরের যুদ্ধ সুদূরপ্রসারী ফলাফল বয়ে এনেছিল তদ্রুপ এ যুদ্ধেও মুসলমানদের বিজয় ইসলামের ভবিষ্যতের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, উর্দু অনুবাদ- শেখ মহম্মদ আহমদ পানিপতি, পৃ: ১৫০-১৫১)

বনু যুবইয়ান এবং বনু আবস গোত্র এ পরাজয়ের কারণে ক্রোধ ও ক্ষোভে নিজ এলাকার মুসলমানদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদেরকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়ে শহীদ করে দেয়। তারা এই প্রতিশোধ নেয়, অর্থাৎ তাদের এলাকায় যেসব নিরস্ত্র মুসলমান বাস করত তাদেরকে হত্যা করে শহীদ করে দেয় আর তাদের অনুকরণে অন্যান্য গোত্রও একই কাজ করে। এসব অত্যাচারের সংবাদ পেয়ে হযরত আবু বকর (রা.) কসম খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি মুশরিকদের যথোচিতভাবে হত্যা করবেন আর যেসব গোত্রে যারাই মুসলমানদের হত্যা করেছে তাদেরকে প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করবেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর নেতৃত্ব এবং দিক-নির্দেশনায় যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের ওপর আক্রমণের পর বিভিন্ন দুর্বল এবং দ্বিধান্বিত গোত্রসমূহ একের পর এক নিজেদের যাকাত নিয়ে মদিনায় আসতে থাকে। দুর্বল গোত্রসমূহ যারা যাকাতের সম্পদ ধরে রেখেছিল তারা যখন শক্তিশালী গোত্রগুলোর এই অবস্থা দেখে তখন তারা যাকাত নিয়ে মদিনায় আসতে আরম্ভ করে। কোন গোত্র রাতের প্রথমাংশে যাকাত নিয়ে আসে, কেউ রাতের মধ্যাংশে আবার কেউবা রাতের শেষাংশে আসে। যখন এরা মদিনায় আসত তখন প্রত্যেক দলের আগমনের সময় লোকজন বলত, এরা ভয়ের কারণ বলে মনে হচ্ছে, অর্থাৎ কোন দুঃসংবাদ আনয়নকারী। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) সকল ক্ষেত্রে এটিই বলেন যে, এরা সুসংবাদ বহনকারী, সমর্থনের জন্য এসেছে ক্ষতিসাধনের জন্য নয়। যাহোক, এটি যখন স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই দলগুলো ইসলামের সাহায্যার্থে এসেছে আর যাকাতের সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছে তখন মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলল, আপনি খুবই কল্যাণমণ্ডিত একজন মানুষ, আপনি সর্বদা সুসংবাদই দিয়ে আসছেন।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬)

এতে হযরত আবু বকর (রা.) এটিও বলেন যে, দুঃসংবাদ এবং মন্দ উদ্দেশ্যে আগমনকারীরা তড়িঘড়ি যাত্রা করে পক্ষান্তরে সুসংবাদ আনয়নকারী দল শান্ত ও ধীরে-সুস্থে যাত্রা করে। আমি তাদের গতিবিধির মাধ্যমে ধারণা করে নিই।

(আল মুসিরাতুল ইসলামিয়া, প্রণেতা- মুনীর মহম্মদ গাযবান, পৃ: ৫০)

যাকাত প্রদানে অস্বিকারকারীদের বিরুদ্ধে সফলতা লাভের পর যাকাত আদায় সম্পর্কে তাবারির ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সেই যুগে মদিনায় এত বেশি যাকাত সমবেত হয় যা মুসলমানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭)

এসব বিজয় এবং সুসংবাদের মাঝেই হযরত উসামার বাহিনীও সাফল্য ও বিজয়মাল্য পরিহিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসে। হযরত উসামার ফিরে আসার পর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মদিনায় নিজের নায়েব নিযুক্ত করেন। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আবু বকর সিনান যামরীকে নিজের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন আর তাকে (অর্থাৎ উসামাকে) এবং তার বাহিনীকে বলেন, এখন তোমরাও বিশ্রাম নাও আর বাহনরূপে ব্যবহৃত পশুগুলোকেও বিশ্রাম নিতে দাও। আর হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং লোকজনের সাথে বাহনে বসে যুল কাস্সা রওয়ানা হন। কিন্তু মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সমীপে নিবেদন করে যে, হে রসূল (সা.)-এর খলীফা! আপনার কাছে খোদার দোহাই দিয়ে অনুরোধ করছি, আপনি স্বয়ং এই অভিযানে যাবেন না। কেননা আল্লাহ্ না করুন, যদি আপনার কোন ক্ষতি হয়ে যায় তাহলে পুরো ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়বে। আপনি এই কাজের জন্য অন্য কাউকে প্রেরণ করুন, যেন তার কোন কিছু হলে আপনি অন্য কাউকে তার স্থলে নিযুক্ত করতে পারেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি কিছুতেই এমনটি করব না। আমি নিজের প্রাণ দিয়ে আপনাদের দুঃখ লাঘব করব।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৩- ২৫৬) (সৈয়্যাদানা আবু বাকার সিদ্দীক শখসীয়্যত ও কারনামে, প্রণেতা- সালাবী, পৃ: ২৮২)

অতঃপর রাবাযাবাসীদের ওপর আক্রমণ সম্পর্কে লিখিত আছে, হযরত আবু বকর (রা.) সবকিছুর ব্যবস্থা করে যু -হিস্সা এবং যুল কাস্সা চলে যান। যুল কাস্সা মদিনা থেকে ৪০ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। নোমান, আব্দুল্লাহ্ আর সুআয়েদ নিজ নিজ স্থানে ছিলেন। এক পর্যায়ে

হযরত আবু বকর আবরাক নামক স্থানে রাবাযাবাসীদের বসতিস্থলে পৌঁছে যান আর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা হারেস এবং অউফকে পরাজিত করেন, যারা মুররা, সালেবা এবং আবাস গোত্রের নেতা ছিল। ফুতায়হাকে জীবিত আটক করা হয়। হযরত আবু বকর কয়েক দিন আবরাক-এ অবস্থান করেন এবং আবরাক অঞ্চলকে মুসলমানদের ঘোড়া সমূহের চারণভূমি বানিয়ে দেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনু আবস এবং বনু যুবইয়ান (গোত্র) তুলায়হার দলে যোগ দেয়, যে সুমায়রা থেকে রওয়ানা হয়ে বুযাখায় অবস্থান গ্রহণ করে। বুযাখা হলো বনু আসাদ গোত্রের ঝরনার নাম, যেখানে তুলায়হা আসাদী-র সাথে হযরত আবু বকরের যুগে ভয়াবহ যুদ্ধ হয়েছিল।

(তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৬) (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ২৩৬) (মুজামুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৪-৪৮৫)

অতঃপর একজন লেখক পরাজিত গোত্রগুলোর আচরণ সম্পর্কে লিখেন, আবাস, যুবইয়ান, গাতফান, বনু বকর এবং মদিনার নিকটে বসবাসকারী অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রগুলোর জন্য সমীচীন ছিল হঠকারিতা এবং বিদ্রোহ থেকে বিরত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও ইসলামী নির্দেশাবলী পালনের অঙ্গীকার করা আর মুসলমানদের সাথে একত্রিত হয়ে মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। বুদ্ধিমত্তার দাবিও এটিই ছিল আর বাস্তব পরিস্থিতিও এটিকেই সমর্থন করতো। হযরত আবু বকরের মাধ্যমে তাদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল। রোমান সীমান্তে সফলতা লাভের কারণে মদিনাবাসীদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর এখন তারা সেই দুর্বল অবস্থায় ছিল না যা বদরের যুদ্ধ এবং প্রাথমিক রণসমূহে তাদের ছিল। তখন মক্কা-ও তাদের সাথে ছিল আর তায়েফও। এই উভয় শহরের নেতৃত্ব পুরো আরবে স্বীকৃত ছিল। এছাড়াস্বয়ং সেই গোত্রগুলোতে বহু এমন মুসলমান ছিল যাদেরকে বিদ্রোহীরা কোনভাবেই নিজেদের দলভুক্ত করতে পারে নি। এভাবে তাদের অবস্থান খুবই দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল আর লাভ লোকসানের চেতনা তাদের মাঝ থেকে হারিয়ে যেতে থাকে। তারা নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে আর বনু আসাদ গোত্রের নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিকারক তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদ-এর সাথে যোগ দেয়। তাদের মাঝে যেসব মুসলমান ছিল তারা তাদেরকে তাদের অভিসন্ধি থেকে বিরত রাখতে পারে নি। তাদের সেখানে পৌঁছানোর ফলে তুলায়হা এবং মুসায়লামার শক্তি বৃদ্ধি ঘটে আর ইয়েমেনে বিদ্রোহের অনল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক কে ফ্যায়সলে, প্রণেতা- আব্দুল্লাহ্ মাদানী, পৃ: ১৭৩-১৭৪, মুশতাক বুক কর্ণার, লাহোর)

যাহোক এটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, তারা বিদ্রোহ করেছিল এবং যুদ্ধ করেছিল। শুধু কোন দাবি বা কারো দাবির কারণে এই যুদ্ধ হয় নি। বিদ্রোহের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হচ্ছিল। আর যে যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল তার উত্তর দেওয়া হচ্ছিল যুদ্ধের মাধ্যমে। যাকাতের অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয় লাভ এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর বীরত্ব ও দৃঢ়সংকল্পের উল্লেখ করতে গিয়ে আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ তার একটিরেওয়ায়েতে বলেন, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর আমরা এমন এক অবস্থানে ছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাধ্যমে আমাদের সাহায্য না করতেন তাহলে ধ্বংস অনিবার্য ছিল। আমাদের সমস্ত মুসলমানের সর্বসম্মত ধারণা এটিই ছিল যে, আমরা যাকাতের উটের জন্য অন্যদের সাথে যুদ্ধ করব না। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে মগ্ন হয়ে যাব যতক্ষণ না আমাদের পূর্ণ বিজয় লাভ হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যাকাতের অস্বীকারকারীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হন। তিনি অস্বীকারকারীদের সামনে কেবল দু'টি বিষয় উপস্থাপন করেন, তৃতীয় কোন বিষয় নয়। প্রথমতনিজেদের জন্য তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা বরণ করে নিতে হবে, আর যদি তা মেনে না নেয় তাহলে যেন তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। নিজেদের জন্য অপমান ও ল াঞ্ছনা বরণ করার অর্থ ছিল তাদের এ কথা স্বীকার করা যে, তাদের নিহতরা জাহান্নামী এবং আমাদের নিহতরা জান্নাতী। তারা আমাদেরকে আমাদের নিহতদের রক্তপণ দিবে। আমরা তাদের কাছ থেকে গনিমতের সম্পদ হিসেবে যা নিয়েছি তা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উত্থাপন করবে না। কিন্তু যে সম্পদ তারা আমাদের কাছ থেকে নিয়েছে তা আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। আর দেশান্ত রের শাস্তি গ্রহণ করার অর্থ হলো, পরাজিত হওয়ার পর নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে এবং দূর দুরান্তের অঞ্চলে গিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে।

(হযরত আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা- মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ১১৮, শিরকত প্রিন্টিং প্রেস, লাহোর)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন,

"মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কতিপয় আরব গোত্র যখন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। তখন পরিস্থিতি এত স্পর্শ কাতর ছিল যে, হযরত উমরের ন্যায় ব্যক্তি তাদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শ নের পরামর্শ দেন। এর উল্লেখ পূর্বেও করা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর (রা.) উত্তর দেন, আবু কোহাফার পুত্রের কী সাধ্য যে, সে সেই আদেশকে রহিত করবে যা মহানবী (সা.) প্রদান করেছেন। খোদার কসম, তারা যদি মহানবী (সা.)-এর যুগে উটের হাঁটু বাঁধার একটি রশিও যাকাত হিসেবে দিয়ে থাকতো তাহলে সেই রশিও আমি তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে ছাড়ব। আর ততক্ষণ ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ তারা যাকাত প্রদান না করবে। তিনি তার সঙ্গীদের বলেন তোমরা যদি এই বিষয়ে আমার সঙ্গ দিতে না পার, তাহলে দিও না। আমি একাই তাদের মোকা বিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি মহানবী (সা.)-এর কত উচ্চ মানের আনুগত্য যে, একান্ত বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে বড় বড় সাহাবীদের লড়াইয়ের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পূর্ণ করার জন্য তিনি সকল প্রকার ঝুঁকি মাথাপেতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান!"

(তফসীর কবীর, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১০৮-১০৯)

অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর এক স্থলে বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে যখন ধর্মত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে আর কেবল গ্রামগুলোতে বাজামা'ত নামায পড়ার রীতি বাকি রয়ে যায়, অধিকন্তু সেনাবাহিনীও সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তাসত্ত্বেও তিনি যাকাত প্রদানকারীদের নামে নির্দেশ প্রেরণ করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে কেউ যদি রশিও দিতো আর এখন না দেয়, তাহলে আমি তরবারির জোরে তা আদায় করব। হযরত উমরের ন্যায় বীর ও সাহসী ব্যক্তিও এই মত প্রদান করেন যে, এখন সময়ের দাবি এটি নয় যে, যাকাতের ওপর জোর দেওয়া হবে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তার কোন কথা শুনেন নি। এ থেকে বোঝা যায় যে, যাকাত কতটা আবশ্যক। "

(মাদারাজে তাকওয়া, আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৩)

এই কথাটি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাঁর এক বক্তৃতার বর্ণনা করেছিলেন যাতে তিনি তাকওয়ার বিভিন্ন স্তরের বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। তাতে তিনি তাকওয়ার ধাপগুলো কি কি আর যাকাতের কতটা গুরুত্ব রয়েছে এবং তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য তা একান্ত আবশ্যক- এসব বিষয়ের উল্লেখ করেন। সেখানে তিনি একথাও বলেছিলেন যে, আহমদীদেরও এই বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, যাকাত কতটা আবশ্যক এবং তা নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

(মাদারাজে তাকওয়া, আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৩)

অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন,

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যাকাত; [যাকাতের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি একথা বলেন;] কিন্তু মানুষজন এটি বোঝে নি। খোদা তা'লা নামাযের পরই এর নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু বকর বলেন, যারা যাকাত দেবে না, তাদের সাথে আমি সেই আচরণই করব যা মহানবী (সা.) কাফেরদের সাথে করতেন। এমন লোকদের পুরুষ সদস্যদেরকে আমি দাস বানাব ও তাদের নারীদেরকে বানাব দাসী। মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর এমন বিপদ উপস্থিত হয় যে, আরবের তিনটি শহর- মক্কা, মদিনা ও আরেকটি শহর ছাড়া সব অঞ্চল মুরতাদ (তথা ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন যে, ঠিক আছে, যাকাতের অস্বীকারকারীদের সাথে সন্ধি করে নিন! প্রথমে অন্য মু রতাদদের সাথে যুদ্ধ হয়ে যাক, ধীরে ধীরে এদেরও সংশোধন হয়ে যাবে। প্রথম প্রয়োজন নবুয়তের মিথ্যা দাবিকারকদের সমূলে বিনাশ করা উচিত, কারণ তাদের সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা অধিক তীব্র। হযরত আবু বকর বলেন, লোকজন যদি ছাগলছানা বা উটের হাঁটু বাঁধার রশির সমান পরিমাণ যাকাতের প্রাপ্য জিনিসও প্রদান না করে যা মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রদান করতো, তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। আর যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে চলে যাও এবং বনের হিংস্র পশুরাও মুরতাদদের সাথে একযোগে আক্রমণ করে, তবে আমি একাই তাদের সাথে লড়ব।"

(বারকাতে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খন্ড, পৃ: ২২২-২২৩)

খিলাফতের কল্যাণরাজির মধ্যে এটিও অন্যতম যে, শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য যুগখলীফা পূর্ণ প্রচেষ্টা করে থাকেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্যত্র বর্ণনা করেন, মানুষজন আরেকটি আপত্তি করে থাকে, কিন্তু খোদা তা'লা সেটির উত্তরও তেরশ' বছর পূর্বেই দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ [অর্থাৎ আপত্তিকারীরা] বলে, شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (সূরা আলে ইমরান: ১৬০) [অর্থাৎ, তাদের সাথে পরামর্শ কর;] নির্দেশটি তো মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে; এর মাঝে খিলাফত এল কোত্থেকে? খিলাফতের জন্য তো এই নির্দেশ

প্রযোজ্য নয়! কিন্তু তারা যেন স্মরণ রাখে যে, যাকাত প্রসঙ্গে যখন হযরত আবু বকরের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপিত হয় সেটিও এ ধরনেরই ছিল যে خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (সূরা তওবা: ১০৩) [অর্থাৎ, তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর]- এই নির্দেশ তো মহানবী (সা.)-কে দেয়া হয়েছে; এখন তিনি নেই, তাই অন্য কারো অধিকার নেই যে, সে যাকাত আদায় করবে। যাকে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত আবু বকর এই উত্তরই প্রদান করেন যে, এখন আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। অর্থাৎ হযরত আবু বকর এখন সম্বোধিত ব্যক্তি। মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু শরীয়ত তো সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে; তাই এখন সম্বোধিত ব্যক্তি হলেন যুগ-খলীফা। হযরত মুসলেহ্ মওউদ যখন এই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন তিনি বলেন, এই সুরে সুর মিলিয়ে আমি আমার ওপর আপত্তিকারীদের বলছি যে, এখন আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যদি সেই সময়ে এই উত্তর সঠিক হয়ে থাকে, এবং অবশ্যই সেটি সঠিক ছিল যা হযরত আবু বকর উত্তরে বলেছিলেন, তাহলে আমি যা বলছি তা-ও সঠিক যে, আজ আমি হলাম সম্বোধিত ব্যক্তি। আর এই নীতিই সর্বদা খিলাফতের ক্ষেত্রে প্রজোয্য হবে। এই কথাটি স্মরণ রাখার মতো! এরপর তিনি বলেন, তোমাদের আপত্তি যদি সঠিক হয়, তবে তো কুরআন শরীফ থেকে অনেক নির্দেশ বাদ দিয়ে দিতে হবে, আর তা হবে সুস্পষ্ট ভ্রান্তি।

(মনসবে খিলাফত, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯-৬০)

এই কথাগুলো তিনি (রা.) ঐ সময়ে বলছিলেন, যখন তিনি মনসবে খিলাফত (বা খিলাফতের মর্যাদার) বিষয়ে একটি বক্তৃতা করছিলেন।এরপর অপর এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ বর্ণনা করেন,মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করলে অনেক অভাগা মুসলমান মুর্তাদ হয়ে যায়। ইতিহাসে লেখা আছে, কেবল এমন তিনটি স্থান অবশিষ্ট ছিল যেখানে মসজিদে বাজামা'ত নামায পড়া হতো। একইভাবে রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় আর তারা বলা শুরু করে যে, মহানবী (সা.)-এর (মৃত্যুর) পর আমাদের কাছে যাকাত চাওয়ার কী অধিকার আছে? যখন এই ধ্যানধারণা পুরো আরবে ছড়িয়ে পড়ে আর হযরত আবু বকর (রা.) এমন লোকদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার মনস্থ করেন তখন হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবীরাও হযরত আবু বকর (রা.) -এর সমীপে এসে উপস্থিত হন আর পূর্বেও যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এসে নিবেদন করেন, এখন পরিস্থিতি বেশ স্পর্শকাতর, এ মুহূর্তে সামান্য অবহেলা বিরাট ক্ষতির কারণ হতে পারে তাই আমাদের পরামর্শ হলো, এত বড় শত্রুর মোকাবিলা করার পরিবর্তে যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করা হোক। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি ভয় পায়, সে যেখানে খুশি চলে যেতে পারে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের একজনও যদি আমাকে সঙ্গ না দেয় তবুও আমি একাই শত্রুর মোকাবিলা করব আর শত্রু যদি মদিনায় প্রবেশ করে এবং আমার প্রিয়জন আর নিকটাত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদেরকে হত্যা করে আর কুকুর যদি মহিলাদের লাশ নিয়ে মদিনার অলি-গলিতে টানাহ্যাঁচড়াও করে তবুও আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব এবং ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না যতক্ষণ এরা উটের পা বাঁধার সেই রশিও যাকাত হিসেবে প্রদান না করে যা তারা পূর্বে প্রদান করত। মোটকথা হযরত আবু বকর (রা.) শত্রুর দুষ্কর্মের বীরবিক্রমে মোকাবিলা করেছেন এবং অবশেষে সফলও হয়েছেন, তা কেবল এ কারণে যে, তিনি (রা.)জানতেন, এ কাজ আমাকেই করতে হবে। তাই তিনি পরামর্শদানকারী সাহাবীদের বলেছিলেন, তোমাদের মাঝ থেকে কেউ আমাকে সঙ্গ দিক বা না দিক, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি আমি একা-ই শত্রুর মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অতএব যে জাতির মাঝে এমন দৃঢ়প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়, তারা প্রত্যেক ময়দানে বিজয়ী হয় আর শত্রু তাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না।"

(কওমী তরক্কী কে দো এ্যাহম ওসুল, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৯, পৃ: ৭৫-৭৬)

এবং জাতীর উন্নতির এটিই রহস্য- যা সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অন্য এক স্থলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর যাকাতেরবিষয়ে মতভেদের কারণে যখন আরবের হাজার হাজার লোক মুর্তাদ হয়ে যায় এবং মুসায়লামা মদিনার ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয় তখন তৎকালীন খলীফা হযরত আবু বকর (রা.) এ বিষয়ে সংবাদ পানযে, মুসায়লামা এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে। এমতাবস্থায় কিছু লোক হযরত আবু বকর (রা.)-কে এই পরামর্শ দেয় যে, এ মুহূর্তে আমরা যেহেতু এক স্পর্শকাতর সময় অতিক্রম করছি আর যাকাত সম্পর্কে মতবিরোধের কারণে লোকজন মুর্তাদ হয়ে যাচ্ছে, আবার অপরদিকে মুসায়লামা বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত, তাই এমন অবস্থার নিরিখে যা সমীচীন বলে অনুমেয় তা হলো, আপনি আপাতত যাকাতের দাবি ছেড়ে দিন এবং তাদের সাথে সন্ধিচুক্তি করে নিন। হযরত আবু বকর (রা.) সেসব শঙ্কার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেন নি। ভ্রুক্ষেপহীনতার প্রকাশ করতে গিয়েপরামর্শদাতাদের তিনি বলেন, তোমরা কি আমাকে সে কথা মানাতে চাও- যা খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত? যাকাতের আদেশ খোদা তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। তাই খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশের বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমার জন্য আবশ্যক। সাহাবীরা পুনরায় বলেন, পরিস্থির নিরিখে সন্ধি করা এখন সময়ের দাবি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনারা যদি যুদ্ধ করতে আগ্রহী না হন এবং শত্রুর মোকাবিলায় যুদ্ধ করার শক্তি-সামর্থ্য না রাখেন তাহলে আপনারা গিয়ে নিজ নিজ গৃহে বসে থাকুন। আল্লাহ্‌র শপথ, আমি শত্রুর সাথে একাই ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাব যতক্ষণ যাকাত হিসেবে প্রদেয় উটের পা বাঁধার রশি প্রদান না করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাদের যাকাত প্রদানের স্বীকারোক্তি আদায় না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কখনো মিমাংসা করব না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, প্রকৃত ঈমানের বৈশিষ্ট্য এটিই।"

(হামারে জিম্মে তামাম দুনিয়া কো ফাতাহ কারনে কা কাম হ্যায়, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮ ,পৃ: ৪৫৮)

অতএব এটিই ঈমান আর এটি যদি আমাদের মাঝে থাকে তবে আমরা পৃথিবীব্যাপী ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হব এবং ইনশাল্লাহ্ সফল হব।

অতঃপর এক স্থলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের গোত্রগুলো বিদ্রোহ করে বসে এবং তারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারাও এই যুক্তি প্রদর্শন করতো যে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) ছাড়া অন্য কাউকে যাকাত আদায়ের অধিকার দেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত হিসেবে কিছু অংশ গ্রহণ কর। এমন কথা কোথাও উল্লেখ নেইযে, মহানবী (সা.)-এর পর অন্য কারো যাকাত গ্রহণের অধিকার রয়েছে, কিন্তু মুসলমানরা তাদের এই যুক্তি গ্রহণ করে নি যখন কিনা সেখানে বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। মোটকথা, তখন যারা মুর্তাদ হয়েছে তাদের শক্তিশালী যুক্তি এটিই ছিল যে, যাকাত গ্রহণের অধিকার কেবল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর ছিল; অন্য কারো নয়। আর এর নেপথ্যে এই ভুল ধারণাটিই ছিল যে, নেযাম (বা ব্যবস্থাপনা) সংক্রান্ত বিধিবিধান সবসময় অনুসরণযোগ্য নয়, বরং তা একান্তই মহানবী (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু তিনি (রা.) বলেন, এটি সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃত বিষয় হলো, যেভাবে নামায-রোযার বিধি-বিধান মহানবী (সা.)-এর যুগাবসানের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায় নি, অনুরূপভাবে জাতিগত বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানও তাঁর (সা.) মৃত্যুর সাথে সাথে রহিত হয়ে যায় নি।বাজামা'ত নামাযের ন্যায় যা একটি সমষ্টিগত ইবাদত, এসব বিধি-বিধানের ক্ষেত্রেও আবশ্যক হলো- মহানবী (সা.)-এর নায়েবদের মাধ্যমে সদা তা বাস্তবায়িত হওয়া।"

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫ , পৃ: ৩০-৩১)

অতঃপর আরেক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা নিযুক্ত হন তখন গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায়। মক্কা-মদিনা আর ছোট্ট একটি উপশহর ছাড়া সবাই যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে এবং বলে, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে বলেছিলেন خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً অর্থাৎ তাদের ধনসম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ কর (সূরা তওবা: ১০৩)। অন্য কারো আমাদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের কোন অধিকার নেই। মোটকথা, গোটা আরব মুর্তাদ হয়ে যায় আর কেবল মুর্তাদ-ই হয় নি বরং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে ইসলাম (প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে) দুর্বল ছিল, কিন্তু আরবের গোত্রগুলো পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণ করতো। কখনো একটি গোত্র আক্রমণ করলে কখনো অন্য গোত্র। আহযাবের যুদ্ধে কাফেরদের সৈন্যবাহিনী যখন জোটবদ্ধভাবে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে সে সময় পর্যন্ত ইসলামঅনেকটা শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছিল; যদিও তখনও ততটা ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে নি যাতে ভবিষ্যতে নিজেদের ওপর আর কোন ধরনের আক্রমণের শঙ্কা নেই বলে মুসলমান রা ধারণা করতে পারে। অতঃপর মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তখন আরবের কয়েকটি গোত্রও তাঁর (সা.) সমর্থনে দণ্ডায়মান হয়। অনুরূপভাবে খোদা তা'লা শত্রুদের মধ্যে উদ্দীপনা ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি করেন যেন তারা গোটা দেশে বিস্তৃতি লাভ করার মতো প্রবল ক্ষমতাধর না হয়ে ওঠে, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে একযোগে গোটা আরব

মুর্তাদ হয়ে যায়; কেবল মক্কা, মদি না ও একটি ছোট উপশহর অবশিষ্ট ছিল আর বাদ বাকি সব স্থানে মানুষ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সৈনাবাহিনী নিয়ে মোকাবিলার উদ্দেশ্যে বের হয়। কেবল যাকাত দিতেই অস্বীকৃতি জানায় নি, বরং তারা সৈন্য নিয়ে লড়াই করতে বেরিয়ে পড়ে। কোন কোন স্থানে তাদের নিকট লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল। আর অপরদিকে এখানে কেবলমাত্র দশ হাজারের একটি সেনাদল ছিল আর তা-ও আবার সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর এটি সেই সেনাদল যা মহানবী (সা.) নিজ মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে রোমীয় এলাকায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত করেছিলেন আর উসামাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। অবশিষ্ট যারা ছিল তারা হয়ত বৃদ্ধ ও দুর্বলরা ছিল বা হাতে গোনা কয়েকজন যুবক ছিল। এই অবস্থা দেখে সাহাবীরা মনে করেন যে, এমন বিদ্রোহের সময় উসামার নেতৃত্বাধীন এই সেনাদলও যদি যাত্রা করে তাহলে মদিনার নিরাপত্তার কোন উপায় থাকবে না। অতএব (এমন পরিস্থিতি দেখে) জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একটি দল হযরত আবু বকর (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হয়; যেমনটি পূর্বে ও বর্ণিত হয়েছে। তারা নিবেদন করে, এই সেনাদলকে কিছুদিনের জন্য যাত্রা করা থেকে বিরত রাখা হোক। যখন বিদ্রোহ দমে যাবে তখন নিঃসন্দেহে এই সেনাদল পাঠানো যাবে, কিন্তু এই মুহূর্তে এটিকে প্রেরণ করা বিপজ্জনক। হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত রাগান্বিত স্বরে বলেন, তোমরা কি চাও মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর আবু কুহাফার পুত্র সর্বপ্রথম যে কাজটি করবে তা হলো, মহানবী (সা.) যে সৈন্যবাহিনীকে প্রেরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন- তা প্রেরণ নিষিদ্ধ করবেন?যাহোক তিনি (রা.) বলেন, এটি যাত্রা করবেই আর মহানবী (সা.) যে সেনাদলকে প্রেরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি সেটিকে অবশ্যই প্রেরণ করব। তোমরা যদি শত্রুসেনাকে ভয় পাও তাহলে নিঃসংকোচে আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করতে পার। আমি একাই সকল শত্রুর মোকাবিলা করব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি يَعۡبُدُوۡنَنِیۡ لَا یُشۡرِکُوۡنَ بِیۡ شَیۡئًا - এর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ। অর্থাৎ, এই মু'মিনরাআমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক দাঁড় করাবে না, অর্থাৎ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিতরা বা খিলাফতের অনুসারীরা। আর এটি হলো সেই অবস্থা- যা খিলাফত ব্যবস্থার সাথে চলমান আছে এবং চলমান থাকবে।

এরপর তিনি (রা.) বলেন, দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল যাকাত বিষয়ক। সাহাবীগণ নিবেদন করেন, আপনি যদি এই সেনাবাহিনীর যাত্রা স্থগিত করতে না পারেন তাহলে অন্তত এটি করুন যে, এদের সাথে সাময়িক সন্ধি করে নিন আর তাদেরকে বলে দিন যে, আমরা এ বছর তোমাদের কাছ থেকে যাকাত নিব না। আর এই সময়ের মধ্যে তাদের উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে আর অনৈক্য দূ র হওয়ার একটি অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এমনটি কখনো হবে না। [তিনি এ কথাও মানেন নি ।] এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন, উসামার সৈন্যবাহিনীও যদি চলে যায় আবার এ সকল লোকদের সাথে সাময়িক সন্ধিও না করা হয় তাহলে শত্রুদের প্রতিরোধ কে করবে? মদিনায় তো শুধু এই কয়েকজন বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তি আর কিছু যুবক রয়েছে, তারা এই লক্ষ সৈন্যের মোকাবিলা কীভাবে করবে? হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, হে বন্ধুরা! তোমরা যদি এদের মোকাবিলা করতে না পার তাহলে আবু বকর একাই তাদের মোকাবিলার জন্য দণ্ডায়মান হবে। হযরত মু সলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই ঘোষণা সেই ব্যক্তির যিনি রণকৌশল সম্বন্ধে খুব বেশি অবগত ছিলেন না আর যার সম্পর্কে সাধারণত এই ধারণাই করা হতো যে, তিনি দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী। তাহলে এই সাহস, এই বীরত্ব, এই বিশ্বাস, এই দৃঢ়তা তাঁর মাঝে কীভাবে সৃষ্টি হলো। এই কথা থেকেই হযরত আবু বকর (রা.)-এর মাঝে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন খোদা তা'লার পক্ষ থেকেই আমি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছি আর আমার ওপরই সকল কাজের দায়িত্ব।

অতএব আমার জন্য আবশ্যক হলো, মোকাবিলা করার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, সফলতা দেওয়া বা না দেওয়া আল্লাহ্ তা'লার হাতে। তিনি যদি সফলতা দিতে চান তাহলে তা দান করবেন আর যদি না দিতে চান তাহলে পুরো সৈন্যবাহিনী মিলেও (আমাকে) সফল করতে পারবে না।

(খিলাফতে রাশেদা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫, পৃ: ৫৪৩-৫৪৫)

হযরত আবু বকর (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কত অসাধারণ ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল- এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবীদের মতের বিপরীতে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে সৈন্যবাহিনীসহ মু'তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অতএব চল্লিশ দিন পর এ বাহিনী নিজ কার্য সমাধা করে বিজয়ীবেশে মদিনায় ফিরে আসে আর সবাই স্বচক্ষে খোদা তা'লার সাহায্য এবং বিজয় অবতীর্ণ হতে দেখে নেয়। এই অভিযানের পর হযরত আবু বকর (রা.) নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদারদের সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং এই নৈরাজ্য এমনভাবে দমন করেন যে, একে একদম পিষে ফেলেন , যার ফলে এই নৈরাজ্য পুরোপুরি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পরবর্তীতে মুরতাদদেরও একই অবস্থা হয়। বড় বড় সাহাবীরাও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে মতোবিরোধ করেন এবং বলেন, যেসব লোক তৌহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করে এবং শুধু যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায় তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে তরবারি উঠানো সম্ভব? কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে বলেন, আজ যদি যাকাত না দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে মানুষ ধীরে ধীরে নামায এবং রোযাও ছেড়ে দিবে আর ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব রয়ে যাবে। মোটকথা এমন অবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী লোকদের মোকাবিলা করেন আর এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছিল তা হলো- এক্ষেত্রেও তিনি বিজয় ও ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত হন এবং সমস্ত বিভ্রান্ত লোক সঠিক পথে ফিরে আসে।

(তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৮)

এই ধারা এখনও চলমান রয়েছে, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতেও এ বিষয়ে আলোচনা করব।

যেভাবে আমি ইদানীং অনবরত আহবান জানিয়ে আসছি, বিশ্ব - পরিস্থিতির জন্য বেশি বেশি দোয়া অব্যাহত রাখুন এবং এ ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করবেন না। বিশেষভাবে এ দোয়া করুন যে, জগদ্বাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে, পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এটিই একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন এবং আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন, আমীন।

এখন আমি একজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করব এবং জুমুআর নামাযের পর (গায়েবানা)জানাযা পড়াব। তিনি হলেন, শ্রদ্ধেয় মওলানা মুবারক নযীর সাহেব। তিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং মু বাল্লেগ ইনচার্জও ছিলেন। গত ০৮ মার্চ তারিখে তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। অত্যন্ত নিঃস্বার্থ, আল্লাহ্ র প্রতি পূর্ণ ভরসাকারী, দোয়ায় অভ্যস্ত এবং অল্পেতুষ্ট মানুষ ছিলেন। নিতান্তই দরবেশ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাকে দেখলে সর্বদাই আমার মাঝে সত্যিকার বুযুর্গ দেখার অনুভূতি জাগ্রত হতো।

তার পারিবারিক পরিচয় দিতে গেলে বলতে হয়- তিনি জামা'তের সফল মুবাল্লেগ মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব এবং শ্রদ্ধেয়া আমেনা বেগম সাহেবার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের প্রবেশ ঘটে তার দাদা হযরত বাবু ফকীর আলী সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে। তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কাদিয়ানের প্রথম স্টেশন মাস্টার নিযুক্ত হয়েছিলেন। কাদিয়ানে তার দাদার বাড়িও ছিল আর সেটি ফকীর মঞ্জিল নামে পরিচিত ছিল। মওলানা মুবারক নযীর সাহেবের পিতা হযরত মওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেবের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ১৯২৯ সনে প্রথমে ঘানাতে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য হয় এবং পরবর্তীতে তার নিযুক্তি হয় সিয়েরা লিওনে। ১৯৪৩ সনে তার পিতা হযরত মওলানা নাযীর আহমদ আলী সাহেব সিয়েরা লিওন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন মুবারক নাযীর সাহেবও তার পিতামাতার সাথে সিয়েরা লিওনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এই সফরে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনাও ঘটেছিল আর মওলানা মুবারক নযীর সাহেব এর উল্লেখ করেছেন। সামুদ্রিক জাহাজে এটি তিন মাস দীর্ঘ একটি সফর ছিল। তখন তার, অর্থাৎ মুবারক নযীর সাহেবের বয়স ছিল ১১ বছর। সফরের মাঝে তিনি অসুস্থ হয়ে যান এবং রোগের প্রকোপ এমন ছিল যে, মনে হচ্ছিল এখন আর বাঁচবেন না। সামুদ্রিক জাহাজের সফর ছিল, যেমনটি আমি বলেছি।জাহাজে উঠছিলেন বা জাহাজ পরিবর্তন করছিলেন অথবা জাহাজে আরোহণ করছিলেন। এটি জাহাজে উঠার পূর্বের ঘটনা। যাহোক জাহাজে আরোহনের পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন আর জাহাজের কর্তৃপক্ষ তার অবস্থা দেখে তার পিতাকে বলেন, আপনার পুত্র তো আধামরা, এর তো প্রাণ যায় যায় অবস্থা। সে যদি সফরে মারা যায় তাহলে আমাদের কাছে লাশ রাখার জন্য কোন হিমাগার নেই, কোন ব্যবস্থা নেই। তাই আপনার এই সন্তানের কারণে আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে পারছি না। মওলানা সাহেব পীড়াপীড়ি করে বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন আর যে কোন মূল্যে আমি এই জাহাজে যাত্রা করব। অতঃপর জাহাজ কর্তৃপক্ষ তাকে একথা লিখে দেয়ার শর্তে জাহাজে বসার অনুমতি দেন যে, তার ছেলে যদি সফরকালীন সময়ে মারা যায় তবে তার

লাশ সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার অনুমতি থাকবে। জাহাজের ক্যাপ্টেন যখন এই শর্তের কথা বলেন তখন মুবারক নযীর সাহেবের মাতা কাঁদতে আরম্ভ করেন, মর্মাহত হন এবং মওলানা নযীর আলী সাহেবকে বলেন, ছেলের স্বাস্থ্যের এহেন অবস্থায় আমরা অন্য কোন জাহাজে সফর করব। মওলানা নযীর আহমদ সাহেব তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমি একজন মুবাল্লেগ যাকে হুযূর একটি দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমি জানি না, অন্য জাহাজ আবার কবে পাব? তার স্ত্রীকে তিনি বলেন, তুমি আশ্বস্ত থাক, মুবারকের কিছুই হবে না। একথা বলে তিনি জাহাজের ক্যাপ্টেনকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, কোথায় স্বাক্ষর করতে হবে? কাগজ নিয়ে আসুন। পুনরায় তিনি ক্যাপ্টেনকে বলেন, এই ছেলে যদি মারা যায় তবে তাকে সাগরে ফেলে দেবেন, কিন্তু একইসাথে আমি একথাও বলছি যে, তার কিছুই হবে না। এটি হলো সেই খোদাভরসা যা তার পিতার খোদা তা'লার সত্তায় ছিল। অর্থাৎ আমি একজন ওয়াক্ফে জিন্দেগী এবং তাঁর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি, এখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমার পরিবার পরিজনের সুরক্ষা করবেন। অতএব আল্লাহ তা'লার কৃপায় সেই ১১ বছরের বালক কেবল জীবিতই ছিল না বরং তিনি ৮৭ বছরের জীবন পেয়েছেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের সেবার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। নিজ পিতৃপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণে জীবন উৎসর্গ করেছেন বা এ সৌভাগ্যও লাভ করেছেন এবং ধর্মসেবার ক্ষেত্রে নিজেও খোদাভরসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

স্নাতক শেষ করার পর সরকারী প্রতিষ্ঠানে তিনি ভালো চাকরিও পেয়েছিলেন, যেখানে তিনি কিছুদিন কাজ করেন। অতঃপর সাময়িকভাবে হলেও ওয়াকফ করুন মর্মে আল ফযলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর আহ্বান পড়ে তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর সমীপে সাময়িক ওয়াকফের আবেদন করেন। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশ অনুসারে ১৯৬৩ সালে তিনি সর্বপ্রথম ওয়াকফে আরযীর জন্য সিয়েরা লিওন চলে যান, যেখানে একটি দীর্ঘ সময় তার পিতা হযরত মওলানা নযীর আলী সাহেবও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার কবরও সেখানে ছিল, অর্থাৎ মৌলভী নযীর আলী সাহেব সেখানেই সমাহিত হয়েছিলেন। সিয়েরা লিওন পৌঁছেই সর্বপ্রথম তিনি তার পিতার কবরে (যিয়ারতের জন্য) উপস্থিত হন। তখন তিনি তার পিতার সেই কথাগুলো স্মরণ করেন যা জনাব মওলানা নযীর আলী সাহেব ২৬ নভেম্বর ১৯৪৫ সালে তার একটি প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতায় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আজ আমরা খোদা তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে জিহাদ করতে এবং ইসলামকে পশ্চিম আফ্রিকায় বিস্তৃত করার লক্ষ্যে যাচ্ছি। মৃত্যু মানুষের সাথে লেগেই থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে আপনারা মনে রাখবেন, পৃথিবীর দূরদূরান্তের কোন একটি অঞ্চলে আহমদীয়াতের মালিকানায় সামান্য এক টুকরো জমি রয়েছে। আহমদী যুবকদের জন্য আবশ্যিক দায়িত্ব হলে, সেখানে পৌঁছা এবং সেই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা যে লক্ষ্যে আমরা সেই ভূখণ্ডকে কবররূপে দখল করেছি। একথার অর্থ হলো, আহমদীয়াতের সামান্য একটু জমি রয়েছে যেখানে একজন আহমদী মুবাল্লেগের কবর বিদ্যমান আর এই কবরের কারণে সেই জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সুতরাং আমাদের কবরগুলোর পক্ষ থেকে এই দাবি থাকবে যে, নিজ সন্তানসন্ত তিকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিন যেন তারা তা পূর্ণ করে, যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছে। অতএব তার শ্রদ্ধেয় পিতার ওসীয়্যত অনুসারে মওলানা মুবারক নযীর সাহেব সেখানে যান এবং পিতার কবরের সামনে উপস্থিত হয়ে বলেন, লাব্বায়েক! আমি উপস্থিত আর আপনার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য আমি এসেছি।

সিয়েরা লিওনের বিভিন্ন স্থানে তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে ১৯৮৫ সালে তিনি পাকিস্তান ফেরত আসেন। ১৯৮৫ সালে আফ্রিকা থেকে ফেরত আসার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সমীপে তিনি অস্থায়ী জীবন উৎসর্গের পরিবর্তে স্থায়ীভাবে জীবন উৎসর্গের আবেদন করেন, যা হুযূর গ্রহণ করেন। এরপর পুনরায় ১৯৮৮ সালে তাকে মুবাল্লেগ হিসেবে কানাডা প্রেরণ করা হয়; যেখানে তিনি বিভিন্ন স্থানে মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০০৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সদয় অনুমোদনক্রমে জামেয়া আহমদীয়া কানাডা চালু করার সিদ্ধান্ত হয় এবং প্রিন্সিপাল হিসেবে তাকে নিযুক্তও করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় জামেয়া চালু হয় নি। পরবর্তীতে আমার যুগে জামেয়া আরম্ভ হয় আর আমিও হযরত খলীফা রাবে (রাহে.) যাকে মনোনীত করেছিলেন তাকে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত দিই যে, তিনিই প্রিন্সিপাল হবেন। যাহোক তিনি জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রথম প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি প্রিন্সিপাল হিসেবে জামেয়াতে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১০ সালে আমি তাকে কানাডার মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে নিযুক্ত করি এবং ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি সর্বমোট ৫৯ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তার অস্থায়ী ওয়াক্ফও স্থায়ী ওয়াক্ফই ছিল। অনুরূপভাবে মওলানা সাহেব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে বেশ কয়েকটি জলসা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার বক্তৃতা আহমদী ও অ-আহমদী সবাই খুব পছন্দ করত। অত্যন্ত প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা প্রদান করতেন। শ্রোতামণ্ডলীকে পুরোপুরি নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নিতেন। ২০১৬ সালে তিনি আমার প্রতিনিধি হিসেবে গুয়াতেমালায় নূর হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর রাখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এছাড়া তার বিভিন্ন তবলীগি প্রবন্ধ কানাডার ন্যাশনাল নিউজ, টরেন্টো স্টার এবং অটোয়া সিটিজেনের মতো পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতো। মওলানা মুবারক নযীর সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন পুস্তক, যেমন- তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া এবং ফতেহ্ ইসলাম-এর ইংরেজি অনুবাদ করারও তৌফিক লাভ করেছেন। এছাড়া হযরত খলীফা তুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর গালফ ক্রাইসিসপুস্তকও তিনি অনুবাদ করেন।

তার স্বজনদের মাঝে তার স্ত্রী আমাতুল হাফিয নাযীর সাহেবা এবং তিন পুত্র ও দুই কন্যা অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন এবং একজন আদর্শস্থানীয় জীবন উৎসর্গকারী ছিলেন আর মুরব্বীদের জন্য এক বিশেষ দৃষ্টান্ত ছিলেন। তার জীবন ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার এক মূর্ত প্রতীক ছিল। সর্বদা জামা'তের সেবা ও যুগ খলীফার আনুগত্যকে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, বক্তৃতা প্রদানের অসাধারণ দক্ষতা রাখতেন, উর্দু এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই তিনি দক্ষতা রাখতেন। গভীর প্রভাববিস্তারী বক্তৃতা প্রদান করতেন। তার স্ত্রী আমাতুল হাফিয সাহেবা লিখেন, সারা জীবন পরম ধর্মভীরুতা ও খোদাভীতির সাথে অতিবাহিত করেছেন। জামা'তের একেকটি পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা করতেন আর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন করেছেন। সিয়েরা লিওন থেকে চলে আসার পরও সেখানকার অনেক গরীবদুঃখী মানুষকে স্থায়ীভাবে নীরবে সাহায্য করতেন। তিনি বলেন, তিনি সর্বোত্তম ওয়াকফে যিন্দেগী হওয়ার পাশাপাশি সর্বোত্তম স্বামী এবং অত্যন্ত স্নেহশীল পিতাও ছিলেন- আমি এ বিষয়ের সাক্ষী। সর্বদা চিন্তিত থাকতেন যে, জামা'ত আমার জন্য অনেক খরচ করছে, সুতরাং আমি কীভাবে জামা'তের কাজে লাগতে পারি? প্রায়ই এ কথা বলতেন যে, যুগ খলীফার অসন্তুষ্টি আমি কোনভাবেই সহ্য করতে পারব না।

তার সন্তানদেরও অভিব্যক্তি রয়েছে। সবাই একথাই লিখেছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এবং পরকালের প্রতি আমাদের পিতার দৃঢ় ঈমান ছিল। খিলাফতের আনুগত্য এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'লার ওপর অনেক বেশি ভরসা করতেন। প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কখনো পরিত্যাগ করবেন না এবং সর্বদা আমাকে সাহায্য করবেন আর তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণও এমনই ছিল। যখন তিনি মিশনারী ইনচার্জ ছিলেন তখন আমীর সাহেব যেখানেই তাকে প্রেরণ করতেন সেখানেও, এছাড়া অবসর গ্রহণের পরও যখন তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয় তখনও মাঝে মাঝে তাকে কাজে লাগানো হতো; তিনি যেখানেই যেতেন আর্থিক কুরবানীর আহ্বান করতেন আর প্রথমে তিনি নিজে অংশ নিতেন তারপর বাকি জামা'তকে অনুপ্রাণিত করতেন। যার কারণে মানুষের ওপর গভীর প্রভাব পড়ত।

তার বড় মেয়ে বলেন, আহমদীয়া খিলাফতের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রাখার পরামর্শ দিতেন। আমাদের মধ্যে সর্বদা তিনি জামা'তী ব্যবস্থাপনার প্রতি ভালোবাসা ও মর্যাদা সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। তার ইচ্ছা ছিল আমরা যেন সর্বদা খলীফাতুল মসীহ্র প্রতিটি নির্দেশের ওপর আমল করি। তিনি বলেন, এমন বৈঠক খুব কমই হতো যেখানে এসব বিষয়ের তাগাদা দিতেন না। যখনই নাতি-নাতনী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী একত্রিত হতো তারা জানত যে, তিনি আমাদেরকে বসিয়ে উপদেশ দিবেন। তার উপদেশে সর্বদা এ বার্তা থাকত যে, আমাদের জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি আমাদের নিশ্চিত করা উচিত যে, আমাদের সম্পর্ক আল্লাহ্ তা'লা

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

ও খিলাফতের সাথে। তিনি বলেন, আমাদেরকে বলতেন, জামা'তের কাজ তো অবশ্যই সম্পন্ন হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা যদি জামা'তের সেবা না কর তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর চেয়ে ভালো কাজ করার জন্য অন্য লোকদের নিয়ে আসবেন।

তার কনিষ্ঠ কন্যা একটি ঘটনা লিখেছেন, সিয়েরা লিওনে একটি মসজিদ নির্মাণের সময় শ্রমিকরা যখন মজুরী দাবি করে (নির্মাণ কাজ চলছিল আর টাকা শেষ হয়ে গিয়েছিল) তখন বাবার কাছে দেয়ার মতো কোন অর্থ ছিল না। মওলানা মুবারক নযীর সাহেব তাদেরকে বলেন, আগামীকাল আসুন পারিশ্রমিক দিয়ে দেব। সকালবেলা তিনি, অর্থাৎ মুবারক নযীর সাহেব বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দেখেন, শ্রমিকরা সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু তখনও অর্থের কোন সংস্থান হয় নি। ফলে তিনি শ্রমিকদেরকে বলেন, আমার কাছে এখন টাকা নেই; কিন্তু আমি দোয়া করছি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ইনশাআল্লাহ্ আল্লাহ্তা'লা শীঘ্রই ব্যবস্থা করবেন। তিনি বলেন, এরই মধ্যে একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে তার কাছে আসে এবং তাকে একটি খাম দেয় যার মধ্যে টাকা ছিল আর তাকে বলে, কোন ব্যক্তি শুনেছিল, আপনি মসজিদ নির্মাণ করছেন, তাই তিনি এ অর্থ পাঠিয়েছেন, এটি রেখে দিন। কে টাকা দিয়েছে– একথা জিজ্ঞেস করার পূর্বেই খাম দিয়ে গাড়িটি দ্রুত চলে যায়। তিনি বলেন, এ বিষয়ে তার বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করেছেন। এভাবে এই অর্থ দিয়ে তিনি শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে দেন।

অতএব এটি ছিল আল্লাহ্ তা'লার ওপর তার তাওয়াক্কুল (ভরসা) এবং তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আচরণ। এ ধরনের তাওয়াক্কুল ও তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারের আরো অনেক ঘটনা রয়েছে যা বিভিন্ন লোক লিখেছে, মুরব্বীরাও লিখেছেন। যেমনটি আমি বলেছি, নিশ্চয় তিনি একজন 'সৎকর্মশীল আলেম' ছিলেন। এজন্যই লোকদের ওপর তার বক্তৃতার অনেক প্রভাব পড়ত। কিন্তু খিলাফতের সম্মুখেতিনি ছিলেন পরম বিনয়ী।

আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ত তি ও বংশধরদের তার পদাঙ্ক অনুসরণকারী করুন। তার সন্তান ও বংশধরদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে জামা'তকেও তার মতো নিঃস্বার্থ সেবক দান করতে থাকুন। বিশেষভাবে কানাডা জামেয়া থেকে যারা পাশ করেছে এমন মুরব্বীরা কীভাবে তিনি তরবিয়্যত করতেন, কীভাবে তবলীগ করা শিখিয়েছেন, কীভাবে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন, কীভাবে ধর্ম শিখিয়েছেন, তার সাথে সম্পর্কযুক্ত অনেক ঘটনা লিখেছেন। যাহোক সেসব মুরব্বী অনেক কল্যাণ লাভ করেছেন। তাদের মনে রাখতে হবে যে, এসব ঘটনা কেবল স্মরণ রাখা বা বর্ণনা করার জন্য যেন না হয়, বরং এসব মুরব্বীকেও এসবের ব্যবহারিক চিত্র হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফিক দান করুন। (সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

****

(সা.)-এর সাহাবাগণ নিজে কিম্বা হুযুর (সা.)-এর নির্দেশে নিজেদের কোনও মেয়েকে কোনও অমুসলিমদের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। বরং এর বিপরীতে হুযুর (সা.) সাহাবাদেরকে সাধারণভাবে নসীহত করেছেন, 'তোমাদের অভিভাবকত্বে থাকা কোনও মুসলমান মেয়ের বিয়ের জন্য যদি কোনও ব্যক্তি খোঁজ নেয় যার ধর্ম এবং চরিত্র তোমার পছন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকলেও তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও । হুযুর (সা.) (ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে) এই বাক্যটি তিন বার পনুরাবৃত্তি করেন।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

এই যুগের হাকা ও আদাল (ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইসলামের এই শিক্ষা অনুযায়ী নিজ অনুসারীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, 'অ-আহমদীদের মেয়েদের বিয়ে করলে কোনও অসুবিধে নেই, কেননা আহলে কিতাব মেয়েদেরকেও বিয়ে করা বৈধ। বরং এতে লাভ আছে, আরও একজন মানুষ এর মাধ্যমে হিদায়াত লাভ করে। কিন্তু নিজের মেয়েকে কোনও অ-আহমদীকে দেওয়া উচিত নয়। পাওয়া গেলে নিয়ে নাও, নিতে অসুবিধে নেই, কিন্তু দিলে পাপ হবে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫২৫)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagwangola, (Murshidabad)

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক 'সা' (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) - এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৬ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত অর্থের সম্পূর্ণটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে।

স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

পরিবারে একটি ইতিবাচক পরিবেশ বজায় থাকা উচিত। সন্তানদের উপর দৃষ্টি রাখুন। তারা যেন ইন্টারনেটে ক্ষতিকর ও অনৈতিকতাপূর্ণ কিছু না দেখে। অনুরূপভাবে সপ্তাহান্তে ছুটির দিনে প্রত্যেক মা শিশুদের সঙ্গে বেশি বেশি সময় অতিবাহিত করা উচিত। নিঃসন্দেহে সংসারে মায়েদের সাহায্য করা পিতাদেরও দায়িত্ব। পিতামাতা এবং সন্তানের মধ্যে এক দৃঢ় পারিবারিক পরিবেশ বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

তাদের তরবীয়তের কল্যাণে কুরআন করীমের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমলকারী হয় আর রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে অনুরাগের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের তরবীয়তের কল্যাণে তারা যেন যুগ ইমাম প্রতিশ্রুত মসীহর সকল উপদেশাবলী শিরোধার্যকারী হয়। এবং তাদের তরবীয়তে সন্তানেরা খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যকারী হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষকে তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে, যাদের প্রতি তিনি প্রীত হন। অতঃপর জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, আমি ইসলামে নারীর মর্যাদার যেদিকগুলির উল্লেখ করেছি, তা থেকে প্রমাণ হয় যে, একজন আহমদী মুসলমান মহিলা কত উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। সেই মর্যাদা উপলব্ধি করা এবং অনুধাবন করা প্রত্যেক আহমদী মহিলার কর্তব্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের মেয়েদের আধুনিক ফ্যাশনের অবলম্বন করা উচিত নয় আর এই ফ্যাশনের বাহ্যিক পরিপাটি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। বরং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন এবং খোদা তা'লার নৈকট্যের সম্পর্ক তৈরীর মাধ্যমে সেই উচ্চ মর্যাদা লাভের চেষ্টা করা উচিত যার দ্বারা খোো তা'লার সন্তুষ্টিভাজন হতে পারে। যদি তারা এটি অর্জন করে নেয়, তাহলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠবে, যার কল্যাণে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম সুরক্ষিত হতে থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতএব, সংক্ষেপে আমি আপনাদের সকলকে নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা এবং দায়িত্বাবলী অনুধাবন করার বিষয়ে জোর দিচ্ছি। আপনাদের সকলের জীবনে এক আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়ন করা উচিত। আর সংসার সামলানোর পাশাপাশি বন্ধুববান্ধবদের মাঝে তবলীগ করার দ্বিগুণ দায়িত্ব পুরো করা উচিত, যাতে আপনারা ইসলামের বাণী প্রচারে নিজেদের মহান ভূমিকা পালনকারী হন। আপনাদের সকলের খিলাফতের সাহায্যকারী হওয়া উচিত, যার ফলে আমাদের জামাতের উন্নতিতে বিপুল বৃদ্ধি ঘটবে।আমি আশা করি, নিউজিল্যাণ্ডের ন্যায় সুদূর প্রান্তের দেশে থেকেও আপনারা এক নতুন আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রতিফলন ঘটাবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আজ পৃথিবী ভয়াবহ অনৈতিকতা, অশ্লীলতা এবং পাপাচারের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে, এবং ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমি আশা করি, আপনারা সকলে মিলে পৃথিবীকে মহাবিনাশের এই বিপদজনক পথ থেকে রক্ষা করতে নিজেদের ভূমিকা

প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হল পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান পাপাচারের বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে লড়াই করব। শৈশব থেকেই সন্তানরা যেন মায়ের সংস্পর্শে থাকে। তাদেরকে যেন এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম কি আর আহমদী মায়ের কাজ হল সব সন্তানের মন-মস্তিষ্কে একথা সঞ্চার করা এবং বুঝিয়ে দেওয়া যে, তাকে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

আরব মহিলা হোক বা অনারব মহিলারা হোক,প্রত্যেক আহমদী মহিলাদের জন্য বার্তা একটাই- প্রথমত নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যা আপনাদের পরিবেশে আপনাকে অন্যদের থেকে পৃথক করবে। বোঝা যাবে যে এরা আহমদী মুসলমান মহিলা যাদের কর্মকাণ্ড, চরিত্র, নৈতিকতা, চালচলন, কথাবার্তা, সব কিছু ইসলামী শিক্ষাসম্মত। দ্বিতীয়ত সব থেকে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি হল আহমদী মেয়েদেরকে, যেমনটি আমি ইতিপুর্বেও উল্লেখ করেছি, সন্তানের লালন পালন দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদেরকে ধর্ম শেখাতে হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

ইউরোপেও পর্দাকে খারাপ চোখে দেখা হয়।

আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে খোদার আদেশ শিরোধার্য করবেন আর তাঁর কারণে যাবতীয় কষ্ট ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহন করবেন, না কি এই সব বিষয়কে ভয় পেয়ে মানুষের কথা মানতে শুরু করবেন আর সমাজের চালচলন অনুসরণ করতে শুরু করবেন। তাই এই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে হাইফা (কাবাবির)-এর আহমদী সদস্যদের অনলাইন সাক্ষাত

৬ই জুন, ২০২১ তারিখে লাজনা ইমাউল্লাহ্,কাবাবীর (হাইফা) হযরত খলীফঅতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর সঙ্গে অন-লাইন সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করে।

হুযুর আনোয়ার টিলফোর্ড স্থিত অফিস থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে ফিলিস্তানী সদস্যরা ১৯৩১ সনে নির্মিত ঐতিহাসিক মসজিদ 'মসজিদ মাহমুদ' থেকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সদর লাজনা কাওয়াকিব উদাহ সাহেবা হুযুর আনোয়ারের সমীপে সংক্ষেপে সংবর্ধনামূলক বক্তব্য রাখেন। এর পর তিনজন লাজনা সদস্যা طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ নাত পেশ করেন।

এরপর সংক্ষিপ্ত একটি প্রেজেন্টেশনের পর লাজানারা প্রশ্ন করার সুযোগ পায়।

এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের কাছে মধ্য প্রাচ্যের বাসিন্দাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কে জানতে চাইলে হুযুর আনোয়ার বলেন: এক রয়েছে বিশেষ বিপদ যা পুরো অঞ্চলকে ঘিরে রেখেছে। বিশেষ করে, মুসলমানদেরকে এতদঞ্চলে বিপদ মাথায় করে থাকতে হয়। দোষ কার, কে প্রথমে শুরু করছে, কার পক্ষ থেকে কি কি নীতি অনুসৃত হওয়া উচিত- এই সমস্ত প্রশ্ন সরিয়ে রেখেই বলা যায় যে অবশ্যই ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে বিপদ রয়েছে। আর আমরা যখনই তাদেরকে সুযোগ দিই তখন সেই বিপদ আরও বৃদ্ধি পায়। তাই এই এলাকায় বিশেষ প্রজ্ঞা অবলম্বন করে থাকতে এবং নিজেদের সঠিক নমুনা উপস্থাপন করতে হবে যেটি হবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাসম্মত নমুনা। আর ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলার সুযোগ যেন কেউ না পায়। সাধারণ বিপদের কথা উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ার বলেন:কেবল এখানকার কথাই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান সব থেকে বড় বিপদটি হল দাজ্জালী শক্তির অপকর্মগুলির প্রচার যা মিডিয়া, ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন উপায়ে পৃথিবীতে প্রচারিত হচ্ছে। এর কারণে ধর্মপ্রাণ পরিবারে জন্ম নেওয়া একটি শিশু নিজের ধর্মকে ভুলে যাচ্ছে আর জাগতিকতার দিকে বেশি করে ঝুঁকে পড়ছে। এর থেকে আমাদের রক্ষা পাওয়ার চেস্টা করা উচিত। এর জন্য শিশুদের সঠিক শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে আর মায়েদেরকে এর জন্য নিজেদের ভুমিকা পালন করতে হবে। শৈশব থেকেই সন্তানরা যেন মায়ের সংস্পর্শে থাকে। তাদেরকে যেন এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্ম কি আর আহমদী মায়ের কাজ হল সব সন্তানের মন-মস্তিষ্কে একথা সঞ্চার করা এবং বুঝিয়ে দেওয়া যে, তাকে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। জগতের মোহ এবং আড়ম্বর যেন তাদেরকে প্রভাবিত না করে। বরং সর্বাবস্থায় এবং সতত ধর্মই যেন প্রাধান্য পায়। আপনারা যদি শিশুদের এমন তরবীয়ত করতে পারেন, তবে আগামী প্রজন্মের রক্ষক হতে পারবেন। আর এটিই বড় চ্যালেঞ্জ। এই সব ছোট খাট চ্যালেঞ্জ আপনাদের স্থানীয় পরিস্থিতি অনুসারে আসে ও যায়, এগুলিকে চ্যালেঞ্জ মনে করবেন না। প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হল পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান পাপাচারের বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে লড়াই করব। যখন আমরা এই সব চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হব,তখন নিজেদের স্থানীয় চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবেলা করতেও প্রস্তুত হব।

এক সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, আরব আহমদী মুসলমান মহিলাদের জন্য আপনার বার্তা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আরব মহিলা হোক বা অনারব মহিলারা হোক,প্রত্যেক আহমদী মহিলাদের জন্য বার্তা একটাই- প্রথমত নিজেদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যা আপনাদের পরিবেশে আপনাকে অন্যদের থেকে পৃথক করবে। বোঝা যাবে যে এরা আহমদী মুসলমান মহিলা যাদের কর্মকাণ্ড, চরিত্র, নৈতিকতা, চালচলন, কথাবার্তা, সব কিছু ইসলামী শিক্ষাসম্মত। দ্বিতীয়ত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আহমদী মেয়েদেরকে, যেমনটি আমি ইতিপূর্বেও উল্লেখ করেছি, সন্তানের লালন পালন দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদেরকে ধর্ম শেখাতে হবে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। সন্তানের পক্ষে মা-বাবার দোয়া কাজে আসে, তাই নিজের তরবীয়ত, তাদের ধর্মশিক্ষা, ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা, খোদার একত্ববাদের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষানুসারে উন্নত নৈতিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি তাদের জন্য দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ যেন তাদেরকে সব সময় ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখেন এবং কখনও তাদেরকে বিপথগামী হতে না দেন।

* এক ভদ্রমহিলা একথার উল্লেখ করেন যে, যে সব মুসলমান মহিলারা পর্দা করে, সমাজের অমুসলিমদের পক্ষ থেকে তাদেরকে সন্দেহ ও কঠোরতার সম্মুখীন হতে হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল, হিজাব পরারেক কেবল সেখানেই খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয় না, বরং ইউরোপেও এই একই দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। ইউরোপের কিছু কিছু দেশে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে, হিজাব পরবে না বা অমুক পাবলিক প্লেসে হিজাব পরবে না। অন্যথায় জরিমানা হবে। এসত্ত্বেও যে সব মহিলা ও যুবতীরা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তারা হিজাব পরিধান করে। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে খোদার আদেশ শিরোধার্য করবেন আর তাঁর কারণে যাবতীয় কষ্ট ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ সহন করবেন, না কি এই সব বিষয়কে ভয় পেয়ে মানুষের কথা মানতে শুরু করবেন আর সমাজের চালচলন অনুসরণ করতে শুরু করবেন। তাই এই সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। কেননা একজন মোমেন মহিলার ঈমান সুদৃঢ় হওয়া উচিত। আমরা যেহেতু মসীহ মওউদ (আ.)কে গ্রহণ করেছি, তাই এই শিক্ষার উপর আমল করা উচিচ যা কুরআন করীমের শিক্ষা আর যার উপর আমল করানোর জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রেরণ করেছেন।

এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, একজন আহমদী মহিলা যদি আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে চাকরী করতে বাধ্য হয়, তবে পরিবারের দায়িত্বাবলী উপেক্ষা না করে কিভাবে তা পালন করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যদি একজন আহমদী মুসলমান মান প্রয়োজনের তাড়নায় চাকরী করে যাতে সংসারের আর্থিক চাহিদাবলী পূর্ণ করতে পারে, তবে তার এমন চাকরী খুঁজতে হবে যাতে সে স্বামীর অফিস থেকে ফেরা এবং সন্তানের স্কুল থেকে ফিরে আসার পূর্বেই বাড়ি পৌঁছে যেতে পারে। এমনটি না হলে শিশু স্কুল থেকে ফেরার পর তাকে স্বাগত জানাতে পারবে না। তাই শিশুদের জানা থাকা দরকার যে, তার মা তাদের জন্য কিছু খাবার তৈরী করে রেখেছে। তাই মুখ-হাত ধুয়ে, কাপড় পাল্টে খাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। হুযুর আনোয়ার বলেন: যে মা চাকরী করে, যে কোনও বিভাগে হতে পারে, তাদের দ্বিগুণ পরিশ্রম করতে হয়। কাজের স্থানেও সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হয় আর সন্তানদেরকেও উপযুক্ত সময় দিতে হয়। তার উচিত সন্তানের সঙ্গে কথা বলা, নৈতিকতার বিষয়ে তাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়া এবং নামায পড়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া। যাইহোক না কেন, প্রত্যেক

রমযানের কল্যাণ একমাত্র তখনই লাভ হবে, যখন মানুষের মাঝে স্থায়ী পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হবে। ঈদের আনন্দও তখনই লাভ হবে যখন এই পরিবর্তনগুলি চিরতরে জীবনের অংশ হয়ে উঠবে।

মসজিদ মুবারক টিলফোর্ড থেকে ১৪ই মে ২০২১ তারিখে হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত ঈদুল ফিতর-এর খুতবার সারাংশ।

তাশাহুদ, তাউয এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা ও অনুগ্রহ। তিনি আমাদেরকে রমযান মাস অতিক্রম করে আজ ঈদের দিন দেখার সৌভাগ্য দান করেছেন। কিন্তু এটিই কি সেই রমযানের উদ্দেশ্য ছিল? আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে কি এটাই চাইতেন যে, আমরা উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন রোযা রেখে ঈদ তথা আনন্দ উদযাপন করি, ভোজনোৎসব আর হইহুল্লোড় করি? আল্লাহ্ তা'লার এই অনুগ্রহকে প্রকৃত অর্থে আমরা তখনই অনুধাবন করতে পারব, যখন রমযানের রোযা এবং এই ঈদ আমাদেরকে সেই উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি দানকারী হবে যা এই রোযা ও ঈদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এই কল্যাণসমূহ এবং পবিত্র পরিবর্তন যা আমরা আনয়ন করতে পেরেছি, তা যদি সত্যিকার অর্থে হয় তবে ত্রিশটি রোযার পর এই বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব, রমযানের কল্যাণ তখনই লাভ হবে যখন মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন স্থায়িত্ব লাভ করে আর ঈদের আনন্দও তখন লাভ হবে যখন এই পরিবর্তন চিরতরে জীবনের অংশে পরিণত হবে। আমরা সৌভাগ্যবান, আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ প্রাণদাস এবং এই যুগের ইমামকে আমরা গ্রহণ করেছি আর তিনি এ প্রসঙ্গে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন যে, একজন মোমেনের কেমন হওয়া উচিত? তাঁর উদ্ধৃতির আলোকে এখন আমি কিছু বর্ণনা করব যে কিভাবে আমরা রমযানের কল্যাণকে অব্যাহত রাখতে পারি এবং কিভাবে প্রকৃত আনন্দ উদযাপনকারী হতে পারি। প্রকৃত ঈদ উদযাপন করতে হলে আমাদেরকে কোন মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা আল্লাহর ইবাদত করার, তাঁকে ভালবাসার দাবি করি। কিন্তু এই ভালবাসার মান কোন পর্যায়ের হওয়া উচিত যাতে করে খোদাকে পাওয়া যায়? এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

প্রকৃত তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খোদা তা'লার ভালবাসা থেকে পুরোপুরি অংশ নেওয়া আবশ্যক। আর সেই ভালবাসা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহারিক অংশটি পূর্ণ না হয়। কেউ যদি মুখে মিছরী উচ্চারণ করতে থাকে, তবে তার কাজেও মিষ্টতা যুক্ত হবে, এমনটা কখনই হয় না। কিম্বা কেউ যদি মৌখিকভাবে বন্ধুত্বের দাবি করে, অথচ বিপদ ও প্রয়োজনের সময় তাকে সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে থাকে, তবে তাকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি খোদার একত্বের কেবল মৌখিক স্বীকারুক্তি থাকে আর তাঁর প্রতি ভালবাসাও যদি কেবল মৌখিক হয়ে থাকে তবে তা কোনও উপকারে আসে না। বরং এই অংশটি মৌখিক স্বীকারুক্তির পরিবর্তে ব্যবহারিক অংশকে বেশি চায়। এর অর্থ এই নয় যে, মৌখিক স্বীকারুক্তির কোনও মূল্য নেই। না, আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, মৌখিক স্বীকারুক্তির ব্যবহারিক সত্যায়নও আবশ্যক। এর জন্য খোদা তা'লার পথে নিজের জীবন উৎসর্গিত করা জরুরী। এটিই ইসলাম। এই উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। অতএব, যে ব্যক্তি এখন সেই নির্ঝরের নিকট আসে না যার ধারা খোদা তা'লা এই উদ্দেশ্যের জন্য সূচিত করেছেন, নিশ্চয় সে হতভাগা।

নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ(আ.) বলেন: নামায অত্যন্ত জরুরী বিষয় আর তা মোমেনের আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগমনের শিখর। নামায হল খোদা তা'লার নিকট দোয়া প্রার্থনা করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। মাথা ঠোকা কিম্বা পাখির ন্যায় ঠুকরানোর জন্য নামায নয়। নামায হল খোদা তা'লার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নাম এবং খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন করার এবং নিজের পাপসমূহের ক্ষমা লাভের ব্যবহারিক রূপ। অতএব, অত্যন্ত যত্নসহকারে নামায পড়। নামাযে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন তোমার চেহারা স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, তুমি খোদার আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছ। আর এমনভাবে নতজানু হও যেন দেখে মনে হয় যে তোমার হৃদয় নতজানু হয়েছে। আর সেই ব্যক্তির ন্যায় সিজদা কর যার হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত হয় আর নামাযে নিজের ধর্ম এবং পৃথিবীবাসীর জন্য দোয়া কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এমন নামায যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সেই দিনটি আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হবে। আমাদের আত্মসমীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত ঈদ উদযাপন করব বলে আমরা কি তা অর্জন করার চেষ্টা করছি? কিম্বা এই রমযানে আমরা কি এই সংকল্প নিয়েছি যে, আগামীতে এইভাবে আমল করে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টার মাধ্যমে নিজেদের জন্য ঈদের উপকরণ তৈরী করব?

একজন প্রকৃত মুসলমানের কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন: খোদার অবাধ্যতা করার জন্য যতই সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোক না কেন, একজন সত্যিকার মুসলমান খোদার আদেশের বাইরে যাওয়াকে নিজের জন্য ধ্বংসের কারণ বলে মনে করে। সুতরাং, একজন প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য খোদা তা'লার ভালবাসা ও আনুগত্য কোনও পুরস্কার অথবা শাস্তির ভয় বা আশার ভিত্তিতে নয়, বরং মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ও অংশ হিসেবে হওয়া জরুরী। তখন সেই ভালবাসা নিজেই তার জন্য একটি বেহেশত তৈরী করে। আর এটিই প্রকৃত বেহেশত। কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত এই পথ অবলম্বন না করে সে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না। তাই তোমাদের মধ্য থেকে যারা আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখ তাদেরকে আমি এই পথ দিয়েই প্রবেশ করার শিক্ষা দিচ্ছি। কেননা এটিই বেহেশতের প্রকৃত পথ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এই বেহেশতই প্রকৃত ঈদের আনন্দ যা আমাদেরকে অর্জন করতে হবে। আমাদেরকে আত্ম পর্যালোচনা করতে হবে যে আমরা কি এই ধরণের ঈদের আনন্দ উদযাপনের জন্য প্রস্তুত? এই বেহেশত অর্জন করার জন্য চেষ্টা করছি?

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: "কুরআন শরীফ পড় এবং খোদা থেকে কখনও আশাহত হয়ো না। কেননা মোমেন কখনও খোদা থেকে আশাহত হয় না। খোদা তা'লা থেকে হতাশ হওয়া কাফেরদের স্বভাব। আমাদের খোদা সমস্ত বিষয়ের উপর শক্তি রাখেন। কুরআন শরীফের অনুবাদও পাঠ কর আর যত্নসহকারে নামায পড় আর এর অর্থও প্রণিধানসহারে পাঠ কর। নিজের ভাষাতেও দোয়া কর। কুরআন করীমকে কোনও সাধারণ গ্রন্থ হিসেবে পাঠ করো না, বরং এটিকে খোদা তা'লার বাণী হিসেবে পাঠ করো। নামায সেইভাবে পড়, যেভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা.) নামায পড়তেন। মসনুন দোয়ার পর নিঃসন্দেহে নিজের চাহিদা ও প্রয়োজনাবলী নিজের ভাষায় খোদা তা'লার নিকট উপস্থাপন কর। এতে কোনও অসুবিধে নেই, নামায নষ্ট হয় না। বর্তমান যুগে লোকেরা নামাযকে বিকৃত করেছে। নামায নয় যেন মাথা ঠুকছে। দ্রুত মাথা ঠুকে নামায শেষ করে নেয় আর নামাযের পর দোয়ার জন্য বসে থাকে। দোয়াই তো নামাযের প্রাণ। নামায শেষ করে দোয়া করলে সেই প্রকৃত উদ্দেশ্য কিভাবে অর্জিত হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এমন নামায এবং কুরআন করীমের প্রতি অভিনিবেশ আমাদের প্রকৃত ঈদ এনে দিবে। আমরা কি এই রমযানে এই সেই ঈদ অর্জন করার জন্য সংকল্প করেছি? যদি না করে থাকি, তবে আজ আমাদের এই অঙ্গীকার করা উচিত যে, যত্নসহকারে নামায পড়ার এবং অভিনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠ

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rasid, Basantapur, 24 Pgs (S)**

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Aseya Begum, Harhari, (Murshidabad)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 21 April, 2022 Issue No. 16

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

করার জন্য ঈদের আনন্দকে চিরস্থায়ী করার অঙ্গীকার করা উচিত আর এটিই এর উপায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন করীমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি কুরআন শব্দটির উপর গভীর অভিনিবেশ করেছি, অতঃপর আমার নিকট প্রকাশিত হয়েছে যে, এই কল্যাণমণ্ডিত শব্দে একটি শক্তিশালী ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেটি হল, এটিই কুরআন অর্থাৎ পাঠযোগ্য কিতাব আর তা একটি যুগে আরও বেশি পাঠযোগ্য কিতাবে পরিণত হবে। সেই সঙ্গে আরও অন্যান্য কিতাবগুলিও পাঠ করার ক্ষেত্রে এর শরিক করা হবে। সেই ব্যক্তি বড়ই ঈমানশূন্য যে কুরআনের প্রতি অনুরাগ পোষন করে না আর দিনরাত অন্যান্য কিতাবের উপর আসক্ত থাকে। আমাদের জামাতের উচিত মনে প্রাণে কুরআন করীম পাঠ এবং এর প্রতি অভিনিবেশের কাজে ব্রতী হওয়া। এখন কুরআন করীমের অস্ত্র ধারণ করলেই তোমাদের বিজয়। এই জ্যোতির সামনে কোনও অন্ধকার টিকতে পারবে না।

অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.)ও একবার বলেছিলেন, যে ব্যক্তির কুরআনের কোনও অংশই মুখস্ত নেই সে এক জনমানবহীন গৃহের ন্যায়। তিনি (সা.) আরও বলেছেন, কুরআন করীম দ্রুত পাঠ করবে না, বরং প্রণিধান সহকারে পাঠ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব, এই রমযানে কুরআন করীম পাঠের প্রতি যে মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অনেকে হয়তো কিছু অংশ মুখস্ত করার চেষ্টাও করেছে, সেগুলিকে মুখস্ত করা এবং বার বার পড়া উচিত যাতে স্মৃতিতে গেঁথে যায় অতঃপর কুরআন করীমের শিক্ষার উপর অভিনিবেশ করার চেষ্টাও করা উচিত। এর আদেশাবলীর বিষয়ে অভিনিবেশ করুন। আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর একনিষ্ঠ দাস ও সেবক যেভাবে বলেছেন, সেগুলির বিষয়ে অভিনিবেশ করুন। আর আমরা যখন মুখস্ত করার, গভীর মনোনিবেশ করার এবং কুরআন করীম বেশি করে পাঠের প্রতি মনোযোগ দিব, তখনই আমরা কুরআনের প্রতি সুবিচার করব আর বলতে পারব যে, এই রমযানের মাঝে আমরা নিজেদের মধ্যে যে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করেছি যার কারণে আমরা কুরআন করীম পাঠ এবং তা অনুধাবনের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে এটিই আমাদের ঈদ। আজকের দিনে কেবল আনন্দ উদযাপন করে এই ঈদটিকে শেষ করলে চলবে না,বরং সবসময়ের জন্য এবং প্রতিদিন আল্লাহ্ তা'লার কিতাব প্রণিধানসহকারে পাঠ করে উপভোগ করতে হবে। আর কেবল উপভোগ করাই নয় বরং এ জন্যও পাঠ করা উচিত যাতে এর শিক্ষা অনুধাবন করে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয় আর আমাদের প্রতিটি দিন ঈদের আনন্দ আনয়নকারী হয়।

হুকুকুল ইবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: স্মরণ রেখো! একজন মুসলমানকে হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ পূর্ণ করার জন্য সর্বোতভাবে প্রস্তুত থাকা উচিত। আর যেভাবে সে মৌখিকভাবে খোদা তা'লাকে তাঁর সত্তা ও গুণাবলীতে এক-অদ্বিতীয় মনে করে, অনুরূপভাবে ব্যবহারিকভাবেও এর বহিঃপ্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং কোমলতাপূর্ণ আচরণ করা উচিত। নিজ ভাইদের সঙ্গে কোনও প্রকার বৈরিতা, বিদ্বেষ ও হিংসে পোষণ করা উচিত নয় আর পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে সরে আসা উচিত। অনেকে নিজেদের মধ্যে বিবাদ ও শত্রুতা পোষণ করে আর নিজের থেকে দুর্বল ও নির্ধন ব্যক্তিদেরকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, একে অপরের নিন্দা ও চর্চা করে আর তাদের অন্তরে বৈরিতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে। কিন্তু খোদা তা'লা বলেন, তোমরা পরস্পর এক হয়ে যাও আর যখন তোমরা এক সত্তায় পরিণত হবে, তখন বলতে পারব যে এখন তোমরা নিজেদের অন্তরকে পবিত্র করে নিয়েছ। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরস্পর বিবাদ মুক্ত হও, ততক্ষণ খোদার সঙ্গেও বিবাদমুক্ত হবে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই আমরা যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই বাসনা অনুসারে নিজেদেরকে তৈরী করব, তখন সেটিই হবে আমাদের প্রকৃত আনন্দ এবং ঈদের দিন। আর এর জন্য আমাদের আত্মপর্যালোচনা করে দেখতে হবে যে আমরা নিজেদের ভাইদের অধিকার প্রদান করছি কি না কিম্বা এই অঙ্গীকার করছি কি না যে আগামী বছর ইনশাআল্লাহ্ তা প্রদানের চেষ্টা করব।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:মানবজাতির প্রতি করুনা ও সহানভুতি করা অনেক বড় ইবাদত আর আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটি একটি অসাধারণ মাধ্যম। যারা দারিদ্র পীড়িতদের প্রতি সদাচারী নয়, তাদেরকে অবজ্ঞা করে, আমার আশঙ্কা হয়, তারা নিজেরাই সেই বিপদে নিপতিত না হয়। আল্লাহ্ তা'লা যাদের প্রতি কৃপা করেছেন, খোদার সৃষ্টি প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সদয় হওয়াই হল সেই কৃপার কৃতজ্ঞতা স্বীকার। আর মানুষের উচিত খোদা প্রদত্ত সেই কৃপা নিয়ে গর্ব না করা আর পশুদের ন্যায় অসহায়দের পদদলিত না করা। হুযুর আনোয়ার বলেন: তাই গরিব ও অসহায়দের সাহায্যই খোদা তা'লার কৃপা ও ভালবাসা আকর্ষণকারী হওয়া উচিত এবং হবে। আর এমনটি হলে তবে হবে প্রকৃত ঈদের দিন। ব্যক্তিগতভাবেও জামাতের মানুষ একে অপরকে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনেও তহবিল রয়েছে, সেখানেও সামর্থবান ব্যক্তিদের কিছু না কিছু দান করা উচিত। রুগীদের সাহায্যার্থে, অনাথদের এবং দারিদ্রপীড়িতদের জন্য তহবিল রয়েছে। এছাড়া রয়েছে অভাব পীড়িত ছাত্রদের জন্য তহবিল এবং এই ধরণের আরও তহবিল রয়েছে যার মাধ্যমে সাহায্য করা হয়। জামাতের সামর্থবান সদস্যদের এদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব,এটি হল সেই শিক্ষা যা প্রকৃত ঈদের আনন্দ এনে দিতে পারে।আমরা যদি এই শিক্ষা অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করি, তবে আমরা প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারী হতে পারব। বছরের কেবল দুটি ঈদই নয়, বরং প্রতিটি দিন আমাদের জন্য ঈদের দিন হবে। কেননা, আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য সঠিক অর্থে তাঁর ইবাদত করার চেষ্টা করব, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষো আরও বেশি পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আমরা কুরআন করীম পাঠ করে এবং অনুধাবন করে তার মেনে চলার চেষ্টা করলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে স্বীয় কৃপার উত্তরাধিকারী করবেন। আমরা বান্দার অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি স্বীয় স্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। এই জিনিসগুলি যে ব্যক্তি লাভ করে, তার ঈদ প্রকৃত ঈদে পরিণত হয়। আমরা যেন এই প্রকৃত ঈদ অর্জনকারী হই সেই জন্য দোয়া ও চেষ্টা থাকা বাঞ্ছনীয়।

****

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহসানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir